Banglapdf.net

প্রণব ভট্ট

সেদিন দু'জনে

AKAS

SUVOM

সে দি ন দু' জ নে

প্রণব ভট্ট
সেদিন দু'জনে
শিকড়

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রথম প্রকাশ   ২১ বইমেলা ২০০২

স্বত্ব   লেখক
প্রকাশক   এম আর মিলন
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

শিকড় ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে
এম আর মিলন কর্তৃক প্রকাশিত
হেরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশদাস লেন
থেকে মুদ্রিত অক্ষর বিন্যাসে
শিকড় কম্পিউটার্স
ফোন ৭১১৬০৫৪

দাম ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 760 031 7

সেদিন দু'জনে

প্রণব ভট্ট

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

(fb.com/groups/Banglapdf.net)

বইপোকাদের আড্ডাখানা

(fb.com/groups/boiipoka)

এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

উ ৎ স র্গ

প্রিয় মানুষ, প্রিয় লেখক
আলী ইমাম

ইদানীং কী হয়েছে কে জানে ! সময় পেলেই আজকাল নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসেন সুমন রহমান। কেন যে সময়ে-অসময়ে নিজেকে নিয়ে এত ভাবেন, নিজেও বুঝতে পারেন না।

কোথা থেকে আজ কোথায় এসেছেন, ভাবতে গেলে নিজেও চমকে ওঠেন ! সত্যি তো, কী ছিলেন আর আজ কী হয়েছেন ! এ যেন আকাশ আর মাটির পার্থক্য !

কোথায় সেই যুবক সুমন, আর কোথায় আজকের সুমন রহমান ! এ যেন সেই যুবক সুমনের সঙ্গে আজকের এই পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই বয়সের সুমন রহমানের কোনও মিল নেই !

কাউকে যদি বলা হয় এই সেই সুমন, যে ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে একদম বখে গিয়েছিল, নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, চেনা-জানা লোকেরা বিশ্বাস তো করবেই না, বরং বলবে লোকটার মাথা খারাপ, নইলে এমন অদ্ভুত কথা কেউ বলে !

সুমন রহমান আজ শুধু বিত্তবান একজন মানুষই নন, চেনা-জানা মানুষের কাছে সম্মানও তাঁর খুব।

এমন একজন সম্মানী মানুষকে সম্মান করবেই বা না কেন ! এমন সৎ ও উপকারী মানুষ হাজারে নয়, আজকাল লাখেও একজন পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

তবে যত ধন-সম্পদই থাক, সুমন রহমানের মধ্যে কেউ কখনও ভুলেও আত্মগরিমা দেখেছে, বলতে পারবে না। এমন মিষ্টভাষী মানুষ সত্যি কমই মেলে। এত শিল্প-কারখানা, এত কর্মচারী কিন্তু কাউকে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন, কারও সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেছেন, বলতে পারবে না কেউ।

কী নেই এখন ! গাড়ি, বাড়ি, টাকা, ব্যবসা–সবই যেন এখন হাতের মুঠোয়। শিপিং, ইন্ডেটিং, নানাবিধ শিল্প-কারখানাসহ এত ব্যবসা, তবু মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণ, কথা-বার্তা সবই সাদামাটা, সাধারণ একজন মানুষের মতো।

খেয়ে না খেয়ে বড় হয়েছেন। তিনি নিজেও জানেন, অভাব, অনটন, দুঃখ, দারিদ্র্য একদিন এসবই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। সুখ কাকে বলে, স্বাচ্ছন্দ্য কাকে বলে শৈশব-কৈশোরে দেখা হয়নি বললেই চলে।

হঠাৎ করে যে জীবনের ভোল আমূল পাল্টে গেছে তাও নয়। নিজেও জানেন, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপটা পেয়ে গেলেন, ঘষা দিলেন, দৈত্যটা এল, আর সে মনিবের হুকুম তামিল করে জীবনের চেহারা-ছবি সব পাল্টে দিয়ে গেল, তা নয়।

তবে এও ঠিক, অনেক কষ্ট করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে বিত্তবান হয়েছেন তাও কিন্তু নয়।

আজও মনে আছে সব। আজও চোখের সামনে যেন সব ভাসছে।

কী করে যে কী হল, আজও হিসেব মেলাতে পারেন না।

একদিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি পর্যন্ত সময়মতো দিতে পারেননি। তখন বলতে গেলে কিছুই ছিল না।

কিন্তু আজ তাঁর কত আছে, তার কোনও গোনা-গুনতি নেই !

অতীত নিয়ে এই যে ভাবনা-চিন্তা তা আসলে বেড়ে গেছে, ইন্টারভিউ বোর্ডে ক'দিন আগে মেয়েটাকে হঠাৎ দেখার পর থেকেই।

মেয়েটাকে দেখেই হঠাৎ যেন চমকে ওঠেন তিনি !

কে এই মেয়ে

সেই চোখ, সেই মুখ ! অবিকল যেন সেরকমই দেখতে !

মনে হয় অনেকদিন আগে দেখা সেই মুখটিকেই, কেউ যেন বসিয়ে দিয়েছে এই সুন্দর মেয়েটির মুখের ওপর।

কতদিন হয়ে গেল। ভাল লাগা-ভালবাসার সেই মুখটিকে কি আজও ভুলতে পেরেছেন তিনি ! নিজেও জানেন, শুধু পারেননি নয়, অনেক চেষ্টা করেও একটুও ভুলতে পারেননি তিনি। সময়ে-অসময়ে কেন যেন এই একটি মুখই কেবল মনের পর্দায় ভেসে ওঠে।

কেন বারে-বারে মনে পড়ে, কেন ভুলতে পারেন না, নিজেও বুঝতে পারেন না সুমন রহমান।

ভালবেসেছিলেন। হ্যাঁ, বড় ভালবেসেছিলেন। বলা যায়, ওটাই ছিল

জীবনের প্রথম এবং একমাত্র ভালবাসা।

এরপর আর একজন এসেছিল জীবনে। তাকে অবশ্য ভালবাসতে চেয়েছেন। কিন্তু ভালবাসতে পেরেছেন কি না তা তিনি নিজেও জানেন না।

তাই বলে কি জীবনে আচমকা মুখোমুখি হয়ে যাওয়া প্রথম ভালবাসাকে ভুলতে চাননি তিনি ? হ্যাঁ, চেয়েছেন। কত চেষ্টা করেছেন ভুলে যেতে তার কোনও ইয়ত্তা নেই ! কিন্তু না, অনেক চেষ্টা করেও সেই ডাগর-ডাগর দু'টি চোখ, সেই মায়াবী সুন্দর মুখ আজও ভুলতে পারেননি তিনি।

এতরকমের ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে হঠাৎ করেই এ বছরের গোড়ার দিকে তাঁর মনে হল, আন্তর্জাতিক মানের একটা ভাল হাসপাতাল করলে কেমন হয় ?

অত ভাবাভাবি করে কখনও কাজ করেননি। এবারও অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেন না।

দ্রুত জয়দেবপুরে কয়েক বিঘা জমি কিনে ফেলেন। দেদার টাকার জোরে চোখের সামনে তরতর করে বিশাল বিল্ডিংও উঠে গেল। বিদেশ থেকে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও নামী-দামি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোটা বেতনে চাকরি নিয়ে এল।

সেদিন নিজে বসেছিলেন হস্পিটালে নতুন পাশ করা কিছু ডাক্তার নিয়োগ দেবেন বলে।

ইন্টারভিউ দিতে আসে মেয়েটা।

দেখেই ভয়ানক চমকে ওঠেন তিনি ! এ কে ! কে এসেছে !

উপমা নয় তো !

অনেকদিন আগে দেখা ভালবাসার সেই মেয়েটি যেন হাসিমুখে আবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে !

হতবাক সুমন রহমান যেন লা-জবাব হয়ে যান ! ঘটনার আকস্মিকতায় কী বলবেন না বলবেন ভেবে না পেয়ে, বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটার মুখের দিকে। ইন্টারভিউ দিতে আসা মেয়েটাকে বসতে বলা উচিৎ, তাও যেন ভুলে যান তিনি।

বসতে বলা হচ্ছে না দেখে মেয়েটিই বলে, 'আমি বসি ?'

মেয়েটির কথা শুনে হতচকিত সুমন রহমান দ্রুত বলেন, 'স্যরি। আপনাকে বসতে বলা হয়নি। বসুন, বসুন।'

মেয়েটি বসে।

মেয়েটি বসতেই সুমন রহমান বলেন, 'আপনার নাম ?'

মাথা নিচু করে বসেছিল। মাথা উঁচু করে বলে, 'আপনি আমার বাবার বয়সী। আমাকে তুমি বললেই বোধহয় ভাল হয়।'

কেন এত খুশি হন, নিজেও বুঝতে পারেন না সুমন রহমান। হা হা করে হেসে তিনি এবার বলেন, 'গুড। ভেরি গুড। আমি তোমার বাবার বয়সী মানে, তুমি আমার মেয়ের বয়সী। তোমাকে তো আমি তুমি বলতেই পারি। তো বলো, তোমার নাম কী, বলো?'

সুমন রহমানের কথা বোধহয় শেষও হয় না, মেয়েটি বলে, 'আমার নাম সুমনা। সুমনা চৌধুরী।'

কী হয় কে জানে! আবার একইরকম হা হা করে হেসে সুমন রহমান বলেন, 'বেশ সুন্দর নাম। বলতেই হবে নামটা শুনে আমার শুধু ভাল নয়, খুব ভাল লেগেছে।'

সুমনা হেসে বলে, 'আপনার নামের সঙ্গে কিন্তু আমার নামের একটা মিল আছে।'

সুমনার কথা শেষ হতে-না হতেই সুমন রহমান বলেন, 'তাই নাকি! তা কী মিল আছে, বলো তো শুনি!'

সুমন রহমানের কথা শুনে ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে মিষ্টি হাসি ঝুলিয়ে সুমনা বলে, 'আপনি এত বড় মানুষ, এত ব্যবসা, এত টাকা আপনার, অথচ এই মিলটাও বলতে পারলেন না! আপনি সুমন। আর আমি হচ্ছি সুমনা। মিল নেই, বলেন?'

আসলে বোধহয় এতটা ভাববার সময় পাননি তিনি। হা হা করে হেসে সুমন রহমান তাই বলেন, 'হ্যাঁ, তাই তো। আমি তো অতটা ভাবিনি। শুধু মিল নয়, এ তো বেশ মিল। আরে, তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে! এত বুদ্ধি তোমার!'

সুমন রহমানের কথা শুনে প্রতিবাদ না করে বোধহয় পারে না সুমনা। তাই বলে, 'আপনি ঠিক বলেননি।'

সুমনার কথা শুনে অবাক হয়ে দ্রুত বলেন সুমন রহমান, 'আমি ঠিক বলিনি! কী বলছ তুমি!'

সুমনা সুমন রহমানের কথা শুনে মিষ্টি হাসে। মিষ্টি হেসে সে এবার বলে, 'নামের এই মিল বোঝার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধিমতী হওয়ার দরকার হয় না। তাই বলছি, কথাটা আপনি ঠিক বলেননি।'

মেয়েটাকে যত দেখেন, ততই যেন অবাক হয়ে যান সুমন রহমান। কেন যেন এ কথা শুনেও রাগ তো নয়ই, বরং ভাল লাগে তাঁর। এবার আর

সশব্দে নয়, নিঃশব্দে হাসেন তিনি। হেসে বলেন, 'কথা তো বেশ ভালই বলো। তো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট কেমন তোমার, এবার বলো তো শুনি ?'

একমুহূর্ত দেরি করে না। সুমনা বলে, 'ভাল।'

আবার হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসেন সুমন রহমান। হেসে বলেন, 'শুধু ভাল বললে তো হবে না। কেমন ভাল, তাও তো বলতে হবে।'

এবারও দেরি করে না সুমনা। দ্রুত বলে সে, 'মাধ্যমিকে আমি মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তৃতীয় হয়েছি। আর উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম, আর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছি।'

কেন এত ভাল লাগে নিজেও বুঝতে পারেন না। চোখ-মুখ সব উজ্জ্বল করে সুমন রহমান বলেন, 'গুড ! ভেরি গুড ! এই না হলে ভাল মেয়ে !'

ভাল মেয়ে শুনে ভাল লাগে না তা নয়। তবু কী ভেবে সুমনা এবার বলে, 'এখনও কোনও প্রশ্নই করেননি। কিছু জিজ্ঞেস না করেই এত দ্রুত ভাল বলাটা কি ঠিক, বলেন ?'

আবার একইরকম হা হা করে হাসেন। খানিক হেসে সুমন রহমান বলেন, 'হাঁড়ির একটা ভাত টিপেই কিন্তু বলে দেয়া যায়, ভাত কতটা কী সেদ্ধ হয়েছে, বুঝেছ মেয়ে ?'

সুমন রহমানের কথা ভাল লাগে না তাও নয়। তবু সুমনা বলে, 'ইন্টারভিউ নিয়ে ভাল লাগলে চাকরি দেবেন, না লাগলে দেবেন না। কিন্তু ইন্টারভিউ না নিয়েই–'

মুখের কথা শেষ করতে পারে না সুমনা। তাকে থামিয়ে দিয়ে সুমন রহমান বলেন, 'তোমার ইন্টারভিউ নেয়া হয়ে গেছে, বুঝেছ ? আরে, আমার মাথার এই যে এত চুল তা এমনি পেকেছে ভেবেছ তুমি ? আমি এমনিতে হাওয়া খেয়ে বুড়ো হয়েছি ভেবেছ ? আরে শোনো, মেঘ দেখেই বলে দিতে পারি, ঝড় কতটা কী হবে না হবে। আর তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে এত কথা বলেও বলতে পারব না, তুমি কতটা ভাল মেয়ে ! যাও, তোমার চাকরি হয়ে গেল।'

খুশির যেন সীমা থাকে না সুমনার। সীমাহীন খুশিতে কী বলবে না বলবে বুঝতে না পেরে সে এবার বলে, 'চাকরি হয়ে গেল মানে ! আর কোনও প্রশ্ন নেই ! ইন্টারভিউ হবে না !'

সুমনার কথা শুনে হা হা করে হেসে সুমন রহমান বলেন, 'ইন্টারভিউ

হবে মানে ! কী বলছ তুমি ! আরে মেয়ে, তোমার ইন্টারভিউ তো এরি মধ্যে হয়ে গেছে।'

কথা শুনে অবাক হয়ে সুমনা বলে, 'ইন্টারভিউ হয়ে গেছে ! '

সুমন রহমান একমুহূর্তও দেরি করেন না। বলেন, 'তা ইন্টারভিউতে তুমি কী হয়েছ, জানো ?'

সুমনা হেসে বলে, 'কী, বলেন ?'

সুমন রহমান আবার একইরকম প্রাণখোলা হাসেন। হেসে বলেন, 'ফার্স্ট, বুঝেছ ? ফার্স্ট হয়েছ তুমি। আরে, এত ভাল একটা মেয়ে তুমি। ফার্স্ট না হয়ে কোনও উপায় আছে, বলো ?'

খোলামেলা এই ধনী মানুষটাকে শুধু ভাল নয়, ভেতরে-ভেতরে খুব ভাল লাগে তার। সুমনা তাই হেসে বলে, 'এখনও তো অনেকের ইন্টারভিউ বাকি রয়েছে। এখনই আমাকে ফার্স্ট বলাটা কি ঠিক ?'

কথা বোধহয় শেষও হয় না সুমনার, টেবিলে একটা মৃদু চাপড় মেরে সুমন রহমান বলেন, 'একশ' বার ঠিক। হাজার বার ঠিক। আমি লোক নেব। এখানে আমার পছন্দই প্রধান। আমি বলছি, তুমিই ফার্স্ট, বুঝেছ ?'

মিষ্টি হেসে সুমনা বলে, 'আমার চেয়ে আরও ভাল, আরও মেধাবী, আরও চৌকস যদি কাউকে পান, তাহলে ? তখন তাকে সেকেন্ড বা থার্ড করে আমাকে ফার্স্ট করা কি ঠিক হবে, বলেন ?'

একমুহূর্তও দেরি করেন না সুমন রহমান। তিনি হেসে বলেন, 'তোমার চেয়ে ভাল কাউকে পাওয়ার কথা ভাবতেই পারি না আমি, বুঝেছ ?'

যদিও এটা-ওটা বলে সুমনা, তবে এটাও বুঝতে পারে মানুষটাকে যার-পর-নাই ভাল লেগেছে তার। সুমনা তাই হেসে বলে, 'তাহলে এখন আমি যাই।'

সুমনার কথা শুনে সুমন রহমান হেসে বলেন, 'যাই বলতে নেই মেয়ে। বলো, আসি।'

সুমনা হেসে বলে, 'ঠিক আছে। আমি এখন আসি।'

কথা বোধহয় শেষও হয় না সুমনার, সুমন রহমান বলেন, 'আরে, আসি মানে, আবার কবে আসবে তা জানো ?'

সুমন রহমানের কথা বোঝার কথা নয়। বুঝতে পারেও না সুমনা। সে তাই বলে, 'কবে আসব, বলেন ?'

স্বভাবসুলভ প্রাণখোলা হা হা করে হেসে সুমন রহমান বলেন, 'আগামী পরশু, সোমবার তুমি আমার মতিঝিলের হেড অফিসে চলে

আসবে, কেমন ?'

সুমন রহমানের কথা শুনে সুমনা হেসে বলে, 'পরশু সোমবার আসব, ঠিক আছে। কিন্তু কখন আসব তা তো বললেন না ?'

রিভলভিং চেয়ারে বসে আবার হেলে-দুলে হা হা করে হাসেন সুমন রহমান। হেসে বলেন, 'আরে, এই জন্যেই তোমাকে আমার এক পলক দেখেই এত ভাল লেগেছে, জানো ? পাকা জহুরির কষ্টি পাথরে সোনা কখনও এত যাচাই-বাছাই করতে হয় না। ও সে হাতে নিলেই বলে দিতে পারে, কোনটা আসল-কোনটা নকল। হ্যাঁ, তুমি কতটা কী মেধাবী, চৌকস সে কথা আমাকে আর বলতে হবে না, বুঝেছ মেয়ে ? ঠিক আছে। তুমি সকাল ঠিক দশটায় আমার সঙ্গে দেখা করবে, কেমন ?'

সুমন রহমানের এ কথার পর আর অপেক্ষা করে না। সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং সুমন রহমানের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেম্বার থেকে বেরিয়ে যায় সুমনা।

সুমনা চলে যায় ঠিকই, কিন্তু সুমন রহমানের ভেতরটায় যেন উথাল-পাথাল এক ঝড় তুলে দিয়ে যায়।

কী ভেবে আর ইন্টারভিউ নেন না।

চেম্বারে একা বসে নিজেকে নিয়ে ভাবেন। নিজের সুখ-দুঃখের অতীত নিয়ে ভাবেন। বর্তমান নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কতটা চেয়েছেন, কতটা পেয়েছেন সে হিসেব করেন। মনে হয় অনেক পেয়েছেন। এতকিছু পেয়েও তারপরও মনে হয় একটা জিনিস বোধহয় এ জীবনে সত্যি পাননি তিনি। তা হচ্ছে, ভালবাসা।

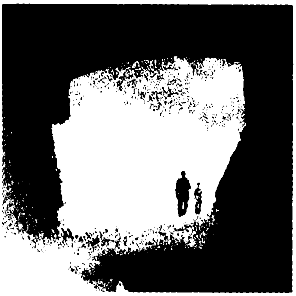

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর সুমন রহমানের কী হয় কে জানে ! কখন সোমবার হবে, কখন স্নিগ্ধ-সুন্দর মুখের মেয়েটার সঙ্গে আবার দেখা হবে, এই একটা ভাবনাই যেন পেয়ে বসে তাকে !

অফিসের ফাইলে গুরুত্বপূর্ণ নোট লিখতে গিয়ে কেন যেন থেমে যান ! অবচেতন মনে মেয়েটাকে নিয়ে ভাবেন। অফিসের কনফারেন্স রুমে বসে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করছেন, কিন্তু মিটিং করার ফাঁকেও দেখা গেল আনমনে হয়তো সুমনা নামের মেয়েটাকে নিয়েই এটা-ওটা কত কী ভাবছেন !

কী হয় কে জানে, উঠতে-বসতে রাত-দিন কেবল মেয়েটাকে নিয়েই ভাবেন তিনি !

কেন সুমনা নামের মেয়েটাকে নিয়ে এত উতলা হয়ে উঠেছেন, কেন তাকে নিয়ে এত ভাবছেন নিজেও বুঝতে পারে না সুমন রহমান ! অবস্থা এমন হয়েছে যে, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তর জানতে চান, কী হয়েছে, কেন ওকে নিয়ে এত ভাবছেন !

নিজের জীবনের প্রথম ভাল লাগা একটা মুখের সঙ্গে, এই মেয়েটার মুখের এত মিল থাকায় কি ওকে নিয়ে এত ভাবছেন ! নিজেও জানেন, না। তা কেন হবে ! এই পৃথিবীতে কতজনের সঙ্গেই তো কতজনের চেহারার মিল থাকে।

মেয়েটাকে খুব ভাল লেগেছে, এটা বুঝতে পারেন। কিন্তু এত ভাল লেগেছে কেন, অনেক ভাবনা-চিন্তার পরও তা বুঝতে পারেন না তিনি।

মেয়েটাকে নিয়ে কত কী ভাবনা-চিন্তার মধ্যে সোমবার দিন সকাল ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় মহিলা সহকারী ইন্টারকমে জানান, সুমনা নামের এক মহিলা এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

কেন যেন ভেবেই রেখেছিলেন, দৃঢ়চেতা মেয়েটা যখন কথা দিয়েছে, তখন সে নিশ্চয়ই আসবে।

মেয়েটা এসেছে শুনেই মনটা তাই অপরিসীম এক খুশিতে ভরে যায়। মেয়েটা আসার কথা শুনে কেন এত ভাল লাগে নিজেও বুঝতে পারেন না তিনি !

ইন্টারকমে মহিলা সহকারীকে বলেন, 'ওকে ভেতরে আসতে দিন।'

সুমনা চেম্বারে ঢুকেই সালাম দেয়।

সালামের জবাব দিয়েই সুমন রহমান বলেন, 'বসো।'

সুমনা মেহগনি কাঠের দামি সিক্রেটারিয়েট টেবিলের অন্য প্রান্তে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে।

কথা বলার মতো কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে সুমন রহমান বলেন, 'ভাল আছ সুমনা ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে সুমনা হেসে বলে, 'কী জানি। বুঝতে পারছি না।'

সুমনার মুখে একথা শুনে স্বভাবতই অবাক হয়ে সুমন রহমান বলেন, 'আরে, কী বলছ তুমি ! তুমি কেমন আছ না আছ, ভাল আছ কী মন্দ আছ, তা তুমি বুঝতে পারছ না !'

সুমন রহমানের কথা শুনে সুমনা হেসে বলে, 'ঠিকই বলেছি। সত্যি আমি বুঝতে পারছি না।'

বিস্ময়ের যেন সীমা থাকে না সুমন রহমানের। তিনি দ্রুত বলেন, 'কেন বলো তো ! কেন বুঝতে পারছ না তুমি !'

সুমনাও যে অপেক্ষা করে তাও নয়। সেও দ্রুত বলে, 'কারণ, এখন আমার ভাল থাকা না থাকা নির্ভর করছে আপনারই ওপর। আপনার কথা শোনার পরই বুঝতে পারব, আমি ভাল আছি-নাকি মন্দ আছি।'

হতবাক হয়ে সুমন রহমান বলেন, 'আমার কথা শুনে তুমি বুঝতে পারবে, তুমি ভাল আছ কী মন্দ আছ ! আরে, তুমি আজ এসব কথা কী বলছ, বলো তো মেয়ে ! তোমার কথার মাথামুণ্ডু তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি তো খুব স্পষ্টবাদী মেয়ে। চাঁছাছোলা কথা বলো। আজ হঠাৎ এভাবে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলা শুরু করেছ কেন, বলো তো !'

সুমন রহমানের কথা শেষ হতেই মিষ্টি হেসে সুমনা বলে, 'সোজাসুজি বলব ?'

সুমন রহমান বলেন, 'সোজাসুজি বলবে নাতো কী ! বাঁকা কথা বলবে নাকি !'

সুমনা একইরকম মিষ্টি হেসে বলে, 'চাকরিটা হলে বুঝব, ভাল আছি। না হলে বুঝব–'

'না হলে বুঝব' পর্যন্ত বলেই সুমনাকে থেমে যেতে দেখে সুমন রহমান বলেন, 'কী হল, থেমে গেলে যে ! চাকরিটা না হলে কী বুঝবে, বলো ?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও যে মুখ-চোখ কোনও কিছু গম্ভীর হয় তা নয়। একইরকম হাসি-হাসি মুখ করে সুমনা বলে, 'আমি জানি, আমার যে রেজাল্ট তাতে আমি বেকার থাকব না। কোথাও না কোথাও চাকরি আমার একটা হবেই। তবে এ চাকরিটা পেলে আমি শুধু খুশি না, খুব খুশি হব। অবশ্য এর পেছনে যে কোনও কারণও নেই, তাও নয়।'

একটুও দেরি করেন না। সুমন রহমান বলেন, 'কী কারণ, বলো শুনি ?'

সুমনার চোখ-মুখের এত হাসি কোথায় উধাও হয়ে যায় কে জানে ! সুমন রহমানের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মাথা নিচু করে খানিক কী যেন ভাবে সে ! ভেবে বলে, 'হসপিটালটার নাম উপমা হাসপাতাল, তাই না ?'

দ্রুত বলেন সুমন রহমান, 'হ্যাঁ। উপমা হাসপাতাল। কিন্তু তাতে কী হয়েছে !'

নিচু মাথা আরও নিচু করে সুমনা আবার একমুহূর্ত কী যেন ভাবে ! তারপর বলে, 'তাতেই সব কিছু হয়েছে। উপমা এমন একজন মানুষের নাম, যে মানুষ এ পৃথিবীতে আমার শুধু প্রিয় নয়, সবচে' প্রিয়।'

সুমন রহমানের চোখের সামনের পৃথিবীটা যেন এক নিমিষে দুলে ওঠে ! দ্রুত বলেন তিনি, 'উপমা নামে তোমার এ পৃথিবীতে প্রিয় কেউ আছে বুঝি ! কে তিনি ! কোথায় থাকেন তিনি ! কী সম্পর্ক তোমার সঙ্গে তার, বলো !'

মাথা নামিয়ে ছিল। চকিতে একপলক মাথা তুলে তাকায় সুমনা। তাকিয়ে বলে, 'একসঙ্গে এত প্রশ্ন করলে কোনটা রেখে কোনটার উত্তর দিই, বলুন তো ?'

যেন তর সয় না সুমন রহমানের। তিনি বলেন, 'তুমি বলো সুমনা ! তুমি বলো ! কোথায় থাকেন তিনি ! উপমা নামের সেই মহিলার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক, বলো !'

আবার আনমনে একমুহূর্ত কী যেন ভাবে সুমনা ! ভেবে বলে, 'কী হয়েছে, বলুন তো ! উপমা নামের কেউ আছে নাকি আপনার ! উপমা নামের কাউকে চেনেন নাকি আপনি !'

সুমনার কাছ থেকে এমন একটা প্রশ্ন শুনবেন বোধহয় ভাবতেও

পারেননি। হতচকিত সুমন রহমান তাই আমতা-আমতা করে বলেন, 'সে কথা থাক। দুনিয়ায় কত উপমা থাকতে পারে। তার কত জনের সঙ্গেই তো আমার পরিচয় থাকতে পারে। তুমি বরং বলো, কে উপমা ! কোথায় থাকেন তিনি ! তোমার সঙ্গেইবা কী সম্পর্ক তাঁর !'

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছিল ! মুখের হাসি-খুশি সব কোথায় উধাও হয়ে যায় কে জানে ! বিষণ্ন দুটো চোখ তুলে সুমনা বলে, 'সম্পর্কটা শুধু রক্তের নয়, হৃদয়ের নয়। বলা যায়, সব কিছুরই।'

সুমনার কথা সুমন রহমান বোধহয় পুরোপুরি বুঝতে পারেন না। তিনি তাই বলেন, 'তোমার কথা কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না সুমনা। উপমা নামের তোমার কি কেউ আছে ! তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী, বলো !'

এবার আর কেন যেন একটুও দেরি করে না। দ্রুত বলে সুমনা, 'রক্তের সম্পর্কে উনি আমার মা।'

সুমন রহমান দ্রুত বলেন, 'কী বললে ! কী বললে তুমি !'

মাথা নিচু করে খানিক কী ভেবে আবার বলে সুমনা, 'মা বললে বোধহয় কম বলা হবে। এই দুনিয়ায় উনি আমার সব।'

সুমনার একথার পর কী ভেবে সুমন রহমান এবার আর কিছু বলেন না। কী বলবেন না বলবেন বোধহয় বুঝতেও পারেন না তিনি।

আনমনে খানিক কী ভেবে সুমনাই আবার বলে, 'বাবার ভালবাসা, মায়ের স্নেহ দিয়ে উনি আমাকে বড় করেছেন। বলা চলে, দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে আড়াল করে রেখেছেন।'

সুমনার একথা শুনে নিজের অজান্তেই সুমন রহমান বলেন, 'শুধু মা'র কথা বলছ। কই, তোমার বাবার কথা তো কিছুই বলছ না তুমি ! বাবার কথাও কিছু বলো সুমনা ?'

এ প্রশ্ন শুনে কী হয় কে জানে ! হঠাৎ এবার অঝোর ধারার কেঁদে ফেলে সুমনা।

সুমনাকে হঠাৎ এভাবে কাঁদতে দেখে হতচকিত সুমন রহমান বলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন সুমনা ! আমি কি তোমাকে খারাপ কিছু বলেছি ! কাঁদার মতো কিছু বলেছি, বলো ! আমার কথায় তুমি কষ্ট পেয়ে থাকলে, আমি সত্যি দুঃখিত সুমনা। বিশ্বাস করো, আমি দুঃখিত।'

ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে সুমনা বলে, 'বাবার কথা থাক।'

যার-পর-নাই অবাক হয়ে সুমন রহমান বলেন, 'কেন ! মা'র মতো বাবাও তো তোমাকে ভালবাসেন। বাবা তার মেয়েকে ভালবাসবেন না তা

তো আর নয়।'

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে সুমনা বলে, 'না, নেই। আমার কোনও বাবা নেই। এই দুনিয়ায় আমি শুধু আমার মা'র মেয়ে।'

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক সুমন রহমান বলেন, 'তা কী করে হয় ! তুমি যেমন তোমার মা'র মেয়ে, তুমি তেমন তোমার বাবারও মেয়ে।'

সুমন রহমানের কথা শুনে সুমনার কী হয় কে জানে ! চোখে এত জল নিয়েও আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে এবার বলে, 'না। আমি মানি না। জন্ম দিলেই বাবা হয়, এ আমি মানি না। কিছুতেই মানি না।'

সুমন রহমান দেখেন উত্তেজনায়, আবেগে সুমনা থরথর করে কাঁপছে।

সুমনাকে এত উত্তেজিত হতে দেখে দ্রুত বলেন সুমন রহমান, 'ঠিক আছে। তোমার বাবার কথা আজ থাক। তুমি না হয় আজ তোমার মা'র কথাই বলো।'

কান্না বোধহয় একটু হলেও থেমেছিল। সুমন রহমানের কথা শুনে কী হয় কে জানে ! আবার ডুকরে কেঁদে উঠে সুমনা বলে, 'কতটুকু ঘৃণা করা যায় একজন মানুষকে ! পর্বত সমান ! সমুদ্র সমান ! হ্যাঁ। ঐ বাবা নামের লোকটার বিরুদ্ধে পর্বত সমান, এক সমুদ্র সমান ঘৃণা দিনের পর দিন ধরে আমার বুকের গভীরে জমা করে রেখেছি আমি, জানেন ?'

সুমনা থামে।

সুমনা থামলেও সুমন রহমান কেন যেন এবার আর কিছু বলেন না। কী বলবেন বোধহয় বুঝতেও পারেন না তিনি।

সুমনাই আবার বলেন, 'আমার এ পৃথিবীতে যত অভিযোগ, সব ঐ একটি মানুষের বিরুদ্ধেই। যত ক্ষোভ ঐ একটি মানুষের বিরুদ্ধে।'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য হলেও সুমন রহমান এবার বলেন, 'মাকে তুমি খুব ভালবাস, না ?'

একমুহূর্তও দেরি করে না। সুমনা বলে, 'হ্যাঁ। ভালবাসি। খুব ভালবাসি। বাবাকে যতটা ঘৃণা করি, মাকে ঠিক ততটাই ভালবাসি আমি ?'

কী ভেবে সুমন রহমান বলেন, 'বাবা বেঁচে আছেন তো ?'

সুমনা বলে, 'হয়তো আছেন।'

সুমন রহমান যার-পর-নাই অবাক হয়ে বলেন, 'হয়তো বলছ কেন ! তুমি জানো না, তোমার বাবা বেঁচে আছেন কি নেই !'

দাঁতে দাঁত চেপে সুমনা বলে, 'না, জানি না।'

হতবাক সুমন রহমান বলেন, 'কেন ? কেন জানো না তুমি ? তোমার

বাবা–

মুখের কথা আধাআধি মুখেই থাকে। সুমন রহমানের মুখ থেকে ঈগলের মতো ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে সুমনা বলে, 'বাবা, না ! বলেছি তো, জন্ম দিলেই বাবা হয়, এ আমি মানি না।'

কী ভেবে সুমনার এ কথার পর সুমন রহমান এবার আর কিছু বলেন না। অবাক হয়ে ক্রোধে জ্বলতে থাকা ক্রন্দনরত সুমনার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল শুধু চেয়ে থাকেন তিনি।

খানিক থেমে সুমনাই আবার বলে, 'আপনি জানেন না, লোকটা মরে গেছে শুনলেই আমি খুশি হব।'

সুমনার কথা শেষ হতে-না হতেই সুমন রহমান বলেন, 'বাবাকে শ্রদ্ধা করতে হয়। বাবাকে এভাবে লোকটা বলা ঠিক নয় সুমনা।'

জলে ডোবা দু'চোখে গনগনে আগুনের মতো তাকিয়ে সুমনা বলে, 'শ্রদ্ধা, না ! ভালবাসা, না ! কাকে শ্রদ্ধা করব ! কাকে ভালবাসব, বলুন ! কোনও এক মানুষকে, না একটা হিংস্র পশুকে ! আপনি জানেন না। আপনি কিচ্ছু জানেন না। আমার কষ্ট জানেন না। আমার দুঃখ জানেন না। এই এক মা যদি দুনিয়ায় না থাকত, কবেই আমি মরে যেতাম, তা জানেন না। বেঁচে আছি তো ঐ এক মমতাময়ী মায়ের মুখ চেয়েই।'

সুমনার কথা শুনে ভারী হয়ে ওঠা পরিবেশ খানিকটা হালকা করার জন্যে হলেও সুমন রহমান খানিকটা হেসে বলেন, 'বাপরে বাপ, তুমি এত ভালবাস তোমার মাকে ?'

মাথা নিচু করে খানিক বোধহয় আনমনে কী ভাবে ! তারপর মাথা উঁচু করে জলে ডোবা দু'চোখে তাকিয়ে সুমনা বলে, 'কী করব, বলুন ! এতবড় এই পৃথিবীতে ঐ এক মা ছাড়া কেউ নেই যে। বাবা থেকেও নেই। মা বলেন, বাবা বলেন, বন্ধু বলেন, প্রিয়জন বলেন, এই পৃথিবীতে ঐ এক মা-ই আছে আমার। আর তো কেউ নেইও যে ভালবাসব।'

সুমনার একথা শুনে সুমন রহমানের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! হতভম্বের মতো খানিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেন, 'আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, আমার সবটুকু পিতৃস্নেহ দিতে চাই, আপত্তি আছে তোমার, বলো ?'

সুমনা যে দেরি করে তা নয়। সে বলে, 'কোথায় আপনি, আর কোথায় আমি ! আপনি কতবড় মানুষ ! কত ধনী ! আপনি আমাকে স্নেহ করবেন কেন ! আমি আপনার কে ?'

সুমনার এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলবেন বোধহয় ভেবে পান না ! তাই কোনওমতে বলেন সুমন রহমান, 'আমি ধনী বলে তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে না, তা কী করে হয় ! আমি তোমাকে স্নেহ করব। ভালবাসব। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করবে। ভালবাসবে। ব্যস।'

চোখে এত জল নিয়েও এই প্রথম সুমনা হাসে। ম্লান হেসে সে এবার বলে, 'বলে-কয়ে আর যাই হোক, ভালবাসা হয় না। ভালবাসা আদায় করে নিতে হয় ভালবাসা দিয়ে। যা আমার জন্মদাতা বাবা পারেননি। তবে—'

'তবে' পর্যন্ত বলেই সুমনাকে থেমে যেতে দেখে সুমন রহমান বলেন, 'কী হল ! থেমে গেলে যে ! তবে কী, বলো !'

জলে ডোবা দুটো চোখে তাকিয়ে সুমনা বলে, 'আপনাকে দেখে, কথা বলে কেন যেন আমার ভাল লেগেছে। মনে হয়, আপনি নিজে আমাকে ভালবেসে, স্নেহ করে, একটু-একটু করে আমার শ্রদ্ধা, ভালবাসা আদায় করে নিতে পারবেন।'

সুমনার কথা এত ভাল লাগে যে, কী বলবেন না বলবেন আর কিছুই বুঝতে পারেন না সুমন রহমান ! তাই কিছু না বলে কেবল হতবাক হয়ে মেয়ের বয়সী সুমনার মুখের দিকে, বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন তিনি।

তাই বলে সুমনা যে চুপ করে থাকে তা নয়। দু'চোখ মুছে সে আবার বলে, 'বাবাকে দেখে দুনিয়ার সব পুরুষ মানুষের ওপরই ঘেন্না জন্মে গিয়েছিল আমার। আপনাকে দেখে কেন যেন মনে হল, আপনাকে বোধহয় শ্রদ্ধা করা যায়। ভালবাসা যায়।'

স্বভাবসুলভ প্রাণখোলা হা হা করে হেসে সুমন রহমান এবার বলেন, 'তুমি তো বেশ ভাল ছাত্রী। জানো না, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ ?'

সুমন রহমানকে অনেকক্ষণ পর হাসতে দেখে নিজেও ম্লান হাসে। কিন্তু কেন যেন এবার আর কিছু বলে না সুমনা।

কী ভেবে সুমন রহমান এবার বলেন, 'চা খাবে সুমনা ?'

অশ্রুভারাক্রান্ত দু'চোখ মুছে সুমনা বলে, 'জি, না। আমি চা খাই না।'

সুমনার কথা শেষ হতেই সুমন রহমান আবার বলেন, 'তো কী খাবে, বলো ? অনেক তো কান্নাকাটি করলে। এবার না হয় কিছু খাও।'

মাথা নিচু করে ওড়নায় চোখ মুছছিল। ভেজা দুটো চোখ তুলে সুমনা বলে, 'কিছু খাব না। আমার এই দুনিয়ায় সবচে' প্রিয় মা'র নামে যে

হসপিটাল, সে উপমা হাসপাতালে একটা চাকরি চাই আমি। চাকরিটা দেবেন কি না, এবার বলেন ?'

আর দেরি করা ঠিক নয় ভেবে সুমন রহমান এবার ড্রয়ার থেকে নিয়োগ পত্রের খামটা বের করে, সুমনার হাতে দিয়ে বলেন, 'এই নাও চাকরি। তা কবে জয়েন করবে, বলো ? ইচ্ছে হলে কালই জয়েন করতে পার। বেতন মাসে সব মিলিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা। তাছাড়া বাড়ি-গাড়িও পাবে তুমি।'

সুমনা খামটা হাতে নিয়ে খোলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলে। আনন্দের আতিশয্যে সে দ্রুত গিয়ে সুমন রহমানকে পা ছুঁয়ে সালাম করে বলে, 'আমি আমার বাবাকে কখনও সালাম করিনি, জানেন ?'

সুমনার কথা শুনে সুমন রহমানের শরীরের প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে অপরিসীম এক খুশি যেন ছড়িয়ে যায় ! কেন এত খুশি লাগে, নিজেও আসলে তা বুঝতে পারেন না তিনি !

সুমন রহমানের অনেক ব্যবসা। অনেক শিল্প-কারখানা। কালে-ভদ্রে তিনি কেবল সে সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, শিল্প-কারখানায় যান।

তিনি আসলে রোজ তাঁর মতিঝিলের বিশাল মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিংয়ের প্রধান কার্যালয়ে বসেই অফিস করেন।

উপমা হাসপাতাল করার পর কী হয় কে জানে ! রোজ একবার না একবার সেখানে যাবেনই যাবেন। শুধু যে যাবেন তাই নয়, প্রতিদিন সুমনার সঙ্গেও দেখা করবেন।

সুমনারও যে কী হয় তা সে নিজেও বুঝতে পারে না ! সুমন রহমান যেদিন সকালে কী দুপুরে, এমন কী বিকেলেও আসে না, সে পথের পানে তাকিয়ে দারুণ ছটফট করতে থাকে। অবশেষে হসপিটালের গেইটে যখন সুমন রহমানের গাড়ির হর্ন শোনা যায়, তখনই কেবল হাফ ছেড়ে বাঁচে সে। কেন এমন লাগে, কেন সুমন রহমানের জন্যে প্রাণ এত কাঁদে, নিজেও তা বুঝতে পারে না সুমনা।

কোনও-কোনও দিন অবশ্য হেড অফিস থেকে জানিয়ে দেয়া হয়, সুমন রহমান কখন আসবেন। আজ যে তিনি বিকেলে আসবেন, সকালেই তা হেড অফিস থেকে হসপিটালে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

রোজ এসেই প্রতিটি ওয়ার্ডে খানিক ঘোরাঘুরি করেন। রোগীদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন, ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেন।

আজ এসে কিন্তু ওসব কিছুই কবেন না। হসপিটালে নিজের জন্যে সাজানো চেম্বারে বসেই সুমনাকে ডেকে পাঠান।

ডাক পেয়েই সুমনা ছুটে আসে।

সুমনাকে দেখেই মৃদু হেসে সুমন রহমান বলেন, 'কেমন আছ সুমনা ?'

একমুহূর্ত দেরি না করে সুমনা বলে, 'ভাল। খুব ভাল। আমার মা'র নাম

উপমা। উপমা হাসপাতালের আমি ডাক্তার। ভাল থাকব না তো কী থাকব, বলেন ?'

সুমনার এত খুশি দেখে সুমন রহমানও খুশি হন না তা নয়। তিনি হেসে বলেন, 'বসো সুমনা। বসে কথা বলো।'

সুমনা বসে।

সুমনা বসতেই সুমন রহমান বলেন, 'আমি তোমাকে আজ এক জায়গায় নিয়ে যাব সুমনা। তুমি যাবে না ?'

চকিতে মুখ তুলে তাকায় সুমনা। তাকিয়ে বলে, 'কোথায় ?'

সুমন রহমান মিষ্টি হেসে বলেন, 'কোথায় নাই বা শুনলে। তুমি যাবে কি না, বলো ?'

আর দেরি করে না। সুমনা হেসে বলে, 'আপনি নিয়ে যাবেন। আর আমি যাব না, তা কি হয় ! যাব। আমি নিশ্চয়ই যাব। আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, আমি নির্দ্বিধায় সেখানেই যাব।'

সুমন রহমান বলেন, 'তুমি খুব ভাল মেয়ে সুমনা।'

সুমন রহমানের কথা শুনে একমুহূর্ত দেরি না করে সুমনা বলে, 'আপনিও ভাল মানুষ। আপনি আসলে নিজেও জানেন না, আপনি কত ভাল একজন মানুষ। কত জনেরই তো টাকা আছে। সেই রাশি-রাশি, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকার জোরে কতজনই তো পেগের পর পেগ মদ খাচ্ছে, কত কী দেদার ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে ! কই, কেউ তো আপনার মতো এমন একটা হসপিটাল করেনি !'

খানিক আগে হাসছিলেন। সুমনার কথা শুনে মুখের এত হাসি কোথায় উবে যায় কে জানে ! একখণ্ড বিষণ্নতার কালো মেঘে এসে ছায়া ফেলে চোখে-মুখে, সমস্ত মুখমণ্ডল জুড়ে। বিষণ্ন দু'চোখ মেলে কোনওমতে বলেন সুমন রহমান, 'হ্যাঁ। একটা কথা ঠিক, মনের টানেই হাসপাতালটা করেছি। তবে এর পেছনে যে কোনও কারণ নেই তাও নয়।'

সুমন রহমানের কথা শেষ হতেই সুমনা বলেন, 'কী কারণ, বলেন ? যৎসামান্য টাকা-পয়সা নিয়েই তো রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে। হসপিটাল থেকে যে কোটি-কোটি টাকা কামাবেন, তেমন ইচ্ছে তো আপনার নেই বোঝাই যাচ্ছে। আর কী কারণ, বলেন ?'

সুমনার কথা শেষ হতেই সুমন রহমান বলেন, 'কারণ অবশ্য একটাই। স্বাস্থ্য সেবা। তবে–'

'তবে' পর্যন্ত বলেই কেন যেন এবার থেমে যান সুমন রহমান।

সুমন রহমানকে কথার মাঝখানে থেমে যেতে দেখে সুমনা দ্রুত বলে, 'কী হল ! থেমে গেলেন যে ! তবে কী, বলেন !'

আনমনে একমুহূর্ত কী যেন ভাবেন ! তারপর সুমন রহমান বলেন, 'তুমি জানো না সুমনা, আমার জীবনের শুরুটা কী ভীষণ দুঃখের ! কষ্টের ! আমার শৈশব, কৈশোর কত বিড়ম্বনার ! কত লাঞ্ছনার ! জানো না তুমি, আমি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি পর্যন্ত সময়মতো দিতে পারিনি ! কখনও-কখনও পচা-বাসি পান্তাও বরাতে জোটেনি আমার, জানো ! খেয়ে-না খেয়ে বড় হয়েছি। প্রাচুর্য কাকে বলে, স্বচ্ছলতা কাকে বলে শৈশবে কী যৌবনে, দেখাই হয়নি আমার। বলা চলে, নুন আনতে পান্তা ফুরানো এক অভাব-অনটনের জীবন দেখে বড় হয়েছি আমি।'

কথা শুনে যেন হতবাক হয়ে যায় সুমনা। হতবাক হয়ে বলে, 'কী বলছেন আপনি ! আমি তো ভাবতেই পারছি না, আপনি একদিন গরিব ছিলেন ! আপনার কিছুই ছিল না ! এও কী সম্ভব !'

একটুও দেরি না করে সুমন রহমান বলেন, 'হ্যাঁ। ছিল না। বিশ্বাস করো, একদিন আমার কিছুই ছিল না। গরিব ছিলাম আমি।'

সুমন রহমান থামতেই সুমনা বলে, 'তারপর ? তারপর কী, বলুন ?'

এবারও একমুহূর্ত দেরি না করে সুমন রহমান বলেন, 'তুমি বিশ্বাস করবে, আমারই চোখের সামনে আমার মা বিনা চিকিৎসায় দিনের পর দিন ধুকে-ধুকে মারা গেছেন ! তখন আমার টগবগে যৌবন। কিন্তু না, আমার সামনে আমার মা বিনা ওষুধে, বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেও আমি কিচ্ছু করতে পারিনি।'

সুমন রহমান থামেন।

অবাক হয়ে সুমনা দেখে পুরু লেন্সের চশমার ওপাশে সুমন রহমানের দু'টি চোখ জলে ভরে উঠেছে।

কেন যেন সুমন রহমান থামলেও সুমনা এবার আর কিছু বলে না। ড্যাবড্যাব করে কেবল নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকে, সুমন রহমানের বিষণ্ন মুখের দিকে।

চোখের জল লুকাবার চেষ্টা করে কোনওমতে সুমন রহমান বলেন, 'আজ আমার সব আছে। কিন্তু মা নেই।'

ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত সুমনা সুমন রহমানের এ কথার উত্তরে কী বলবে না বলবে বুঝতে পারে না। সে তাই বলে, 'মা তো আর কারও চিরদিন বেঁচে থাকে না।'

কথা বোধহয় শেষও হয় না সুমনার। একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুমন রহমান বলেন, 'মা'র বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়ার কথা ভেবেই হসপিটালটা করেছি। আমার মাকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। ক'জন মানুষও যদি সুচিকিৎসা পায়, এই ভরসায় আসলে হসপিটালটা করা।'

কী ভেবে সুমনা বলে, 'আপনার মা'র নাম কী?'

একমুহূর্তও দেরি করেন না সুমন রহমান। দ্রুত বলেন, 'মরিয়ম বানু।'

সুমন রহমানের কথা শেষ হতেই সুমনা বলে, 'হসপিটালটার নাম–'

মুখের কথা শেষ করতে পারে না সুমনা। কথা আধাআধি শেষ হওয়া আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে সুমন রহমান বলেন, 'হাসপাতালটা কার নামে করা যায় অনেক ভেবেছি। মা'র নামে করব, না জীবনে পথ চলতে একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার নামে করব ভেবেছি। পথ চলতে আসলে দেখা হয়েছে বললে ভুল বলা হবে। জীবনে সে প্রথম আমাকে ভালবেসেছে। আমিও তাকে হৃদয়-মন দিয়ে ভালবেসেছিলাম।'

সুমন রহমান একটানা কথা বলে থামেন।

সুমন রহমান থামতেই কী ভেবে সুমনা বলে, 'জীবনে পথ চলতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁকে ভালবেসেছেন। কিন্তু তাঁকে জীবনে পাননি কেন!'

সোনালি ফ্রেমের চশমার ওপাশ থেকে বিষণ্ন দু'চোখ মেলে তাকান। তাকিয়ে সুমন রহমান বলেন, 'তাঁকে পাইনি কথাটা ঠিক নয়। পেয়েছি। আবার হারিয়েও ফেলেছি। এরচে' বোধহয় দেখা না হওয়াই ভাল ছিল সুমনা। না পাওয়াই ভাল ছিল, জানো! জীবনে ওকে হারিয়েই বুঝতে পারলাম, পেয়ে হারানোর ব্যথা এত কষ্টের! জীবনভর সেই কষ্ট আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। আরও কত দিন বয়ে বেড়াবো কে জানে!'

কথা বোধহয় পুরোপুরি শেষও হয় না সুমন রহমানের, সুমনা বলে, 'আপনার এখন আর কেউ নেই?'

একমুহূর্ত দেরি না করে কথার পিঠে সুমন রহমান বলেন, 'প্রিয়জন কেউ আছে কী নেই জিজ্ঞেস করছ?'

সুমনা বলে, 'জি।'

সুমন রহমান বলেন, 'আছে। আবার নেইও।'

কথা শুনে যার-পর-নাই অবাক হয়ে সুমনা বলে, 'আরে, আপনার কথার মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আছে, আবার নেইও!

কী অর্থ হল এর, বলুন তো !

সুমনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আনমনে কী যেন ভাবেন সুমন রহমান ! তারপর বলেন, 'স্ত্রী আছে। তবে কার এ্যাক্সিডেন্টে সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছে।'

সুমন রহমান থামতেই সুমনা বলে, 'একেবারে পঙ্গু ! নড়তে-চড়তেও পারে না !'

এ প্রশ্নের উত্তরে সুমন রহমান কেন যেন কিছু বলেন না। মাথা নেড়ে কেবল সম্মতি জানান।

তাই বলে সুমনা যে চুপ করে থাকে তা নয়। সে আবার বলে, 'তা উনি কথা বলেন তো ? নাকি তাও–'

'নাকি তাও' পর্যন্ত বলেই আর বলতে পারে না সুমনা। থেমে যায়।

সুমনাকে থেমে যেতে দেখে সুমন রহমান বলেন, 'হ্যাঁ। পারে। পুরোপুরি না হলেও একটু-একটু পারে। খুব আস্তে-আস্তে টেনে-টেনে কথা বলে।'

কী ভেবে সুমনা আবার বলে, 'প্রিয়জন বলতে এই একজন ! আর কেউ নেই আপনার !'

একমুহূর্ত দেরি না করে সুমন রহমান বলেন, 'ঐ যে বলেছি, আছে, আবার নেইও। আমার স্ত্রীর একটা সন্তান আছে।'

হতবাক সুমনা দ্রুত বলে, 'শুধু আপনার স্ত্রীর সন্তান বলছেন কেন, বলুন তো ! আপনার স্ত্রীর সন্তান তো আপনারও সন্তান।'

অনেক দুঃখেও ম্লান হেসে সুমন রহমান বলেন, 'ওকে আমার সন্তান বলে মানি না, ভালবাসি না তা তো নয়। ভালবাসি। বিশ্বাস করো, খুব ভালবাসি ওকে। কিন্তু এও তো ঠিক, ও আমার রক্ত নয়। আমি ওর জন্মদাতা নই।'

ঘটনার আকস্মিকতায় সুমনা ফ্যালফ্যাল করে খানিক সুমন রহমানের দুঃখ ভারাক্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'কী বলছেন আপনি, বলুন তো ! আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুমন রহমান বলেন, 'যাকে ভালবেসেছি, তাকে পাইনি। যাকে পেয়েছি, তাকে ভালবাসতে চেয়েছি। কিন্তু পেরেছি কি না জানি না। তবে যাকে পেয়েছি, তাকে তার সন্তানসহই এ জীবনে পেয়েছি।'

সুমন রহমানের কথা তখনও বুঝতে পারে না সুমনা। সে তাই বলে,

'কী বলছেন আপনি ! আপনি আপনার স্ত্রীকে কি সন্তানসহ বিয়ে করেছেন, বলেন ! ওনার কি তাহলে আগে আর একবার বিয়ে হয়েছিল !'

চোখ দুটো আবার জলে ভরে ওঠে। ছলছল চোখে তাকিয়ে সুমন রহমান কোনওমতে বলেন, 'হ্যাঁ, হয়েছিল। আমি আমার অসহায় পঙ্গু স্ত্রীকে তার সন্তানসহ বিয়ে করেছি, সুমনা।'

হতচকিত সুমনা সুমন রহমানের এ কথার পর কী ভেবে বলে, 'আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসতে চেয়েছেন, এ কথা একটু আগে বলেছেন। কিন্তু পেরেছেন কি না জানেন না। কিন্তু ওনাকে আপনি বিয়ে করেছেন। উনি আপনার স্ত্রী। ওনাকে তো আপনার ভালবাসা উচিৎ ছিল। কী বলেন, ছিল না !'

কথা বোধহয় শেষও হয় না সুমনার, সুমন রহমান তাঁর বিষণ্ন দুটো চোখে তাকিয়ে বলেন, 'ভালবাসার কি কোনও ব্যাকরণ আছে সুমনা ! ভালবাসা কি কোনও নিয়ম-নীতি মেনে চলে কখনও, বলো তুমি ! ভালবাসা তোমার অংকের খাতা নয় সুমনা, যে সরল-সোজা অংকের মতো সব মিলে যাবে। আমি কিন্তু ভালবাসতে চাইনি তা নয় ! চেয়েছি। হয়তো কিছুটা পেরেছি। হয়তো কিছুটা পারিনি।'

সুমন রহমানের কথা শুনে মাথা নিচু করে খানিক কী যেন ভাবে সুমনা ! ভেবে সে এবার বলে, 'একটা প্রশ্ন করব ? কিছু মনে করবেন না তো, বলেন ?'

সোনালি ফ্রেমের চশমার ওপাশ থেকে দুটো ছলছল চোখে তাকিয়ে সুমন রহমান দ্রুত বলেন, 'বেশ তো, বলো তুমি ? মনে করব কেন ?'

সুমনা এবার বলে, 'প্রশ্নটা যদিও একেবারে ব্যক্তিগত, তবু সাহস করে প্রশ্নটা না করে আর পারছি না। জীবনে যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যাঁকে ভালবেসেও জীবনে আপন করে পাননি, তাঁকে ভুলতে পারেননি, না ?'

মাথা নিচু করে আনমনে কী যেন ভাবছিলেন সুমন রহমান ! সুমনার এ প্রশ্ন শুনেই চকিতে বিষণ্ন দু'চোখ তুলে তাকান। তাকিয়ে বলেন, 'চেষ্টা করিনি তা নয়। করেছি। বিশ্বাস করো সুমনা, আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেন যেন পারিনি। আসলে এ তো আর খুকুর বর্ণমালা শেখার শ্লেট নয়, যে ইচ্ছে মতো লিখলাম, আবার ইচ্ছে হল মুছে দিলাম। এ আমার প্রথম ভালবাসা। এ আমার প্রথম স্বপ্ন দেখা। ভুলতে চাইলেও পারব কেন, বলো !'

সুমন রহমানের কথা শুনে কী ভেবে সুমনা এবার বলে, 'আপনি আপনার পঙ্গু স্ত্রীকে তাঁর একমাত্র সন্তানসহ বিয়ে করেছেন, বলছেন। উনি

কি বিয়ের আগে পঙ্গু হয়েছেন ! নাকি বিয়ের পর–'

মুখের কথা শেষ করতে পারে না সুমনা। কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে সুমন রহমান বলেন, 'বিয়ের আগেই কার এ্যাক্সিডেন্টে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য তার তখন ঘর ছিল। স্বামী ছিল। ঐ এক সন্তানও ছিল। ও পঙ্গু হয়ে গেলে ওকে সন্তানসহ বিয়ে করি আমি। বলতে পারো, কোনও জড় পদার্থকে নয়, রক্ত-মাংসের একজন মানুষকেই জীবনসঙ্গিনী করেছি আমি। কিন্তু–'

'কিন্তু' পর্যন্ত বলেই কেন যেন আর বলতে পারেন না সুমন রহমান। থেমে যান।

তাই বলে সুমনা যে চুপ করে থাকে তা নয়। সুমন রহমানকে হঠাৎ এভাবে কথার মাঝখানে থেমে যেতে দেখে সে বলে, 'কী হল ! থেমে গেলেন যে ! কিন্তু কী, বলেন !'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটুও ভাবেন না। সুমন রহমান দ্রুত বলেন, 'পাথরের বেদিতে পাথরের প্রতিমা দেখেছ কখনও সুমনা ! ঠিক যেন তাই। পাথরের মূর্তির মতো সারা জীবন কেবল বিছানায় নড়াচড়াহীন পড়ে থেকেছে। তারপরও বিশ্বাস করো সুমনা, আমি সূচনাকে ভালবাসতে চাইনি তা নয়। চেয়েছি।'

সুমন রহমানের কথা শুনে সুমনা বলে, 'আপনার স্ত্রীর নাম সূচনা বুঝি !'

সুমন রহমান বলেন, 'হ্যাঁ। সূচনা। খুব মিষ্টি নাম না, বলো ?'

নামটা সুমনারও ভাল লাগে। সে তাই বলে, 'হ্যাঁ। খুব মিষ্টি একটা নাম। মানুষটাও নিশ্চয়ই তাঁর নামের মতোই সুন্দর, মিষ্টি, কি বলেন ?'

সুমন রহমানের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আনমনে খানিক কী যেন ভাবেন ! ভেবে বিড়বিড় করে বলেন তিনি, 'সৃষ্টিকর্তা যেন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিলতিল করে ওকে গড়েছেন। যাকে বলে, এক সর্বনাশা সুন্দর !'

কথা শুনে অবাক না হয়ে আর পারে না। অবাক হয়ে সুমনা বলে, 'সর্বনাশা সুন্দর বলছেন কেন আপনি ! সুন্দর তো সুন্দরই, সে আবার সর্বনাশা হতে যাবে কেন, বলেন !'

মাথা নিচু করে খানিক আনমনে কী ভাবেন ! তারপর আবার রিভলভিং চেয়ারে বসে সুমন রহমান বলেন, 'তিলতিল করে গড়া তিলোত্তমার মতো সুন্দর। ভালবেসে বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে। বিধাতার নিজ হাতে গড়া

এত সুন্দর বিছানায় পড়ে থাকলে, সর্বনাশা সুন্দর বলব নাতো কী, বলো !'

কী ভেবে সুমনা এবার বলে, 'আপনার এক জীবনে আসা দুই ভালবাসা। উপমা ও সূচনা। বাহ্ ! কী সুন্দর ! তা এ দু'জনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর, বলুন তো ?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুমন রহমান মাথা নিচু করে একমুহূর্ত কী ভাবেন ! ভেবে বলেন, 'দু'জনেই সুন্দর। একজন স্নিগ্ধ সুন্দর। অন্যজন চোখ ধাঁধানো সুন্দর। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর নিয়তি দেখো, একজনকে পেয়ে হারিয়েছি। অন্যজন জড় পদার্থের মতো নিশ্চুপ পড়ে আছে। ভালবেসে কাছে টেনে নিতে পারি না। একটা জীবন। দুই ভালবাসা। কিন্তু–'

'কিন্তু' পর্যন্ত বলেই কেন যেন আর বলতে পারেন না সুমন রহমান। থেমে যান।

সুমনা দেখে সুমন রহমানের দু'চোখ আবার জলে ভরে উঠেছে। সুমন রহমানের জল টলমল দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে, সুমনা প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে দ্রুত বলে, 'আপনি যেন আজ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন বলেছিলেন ? কি হল, যাবেন না সেখানে ?'

সুমনার কথায় বোধহয় হুঁশ হয়। দ্রুত হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুমন রহমান বলেন, 'হ্যাঁ, তাই তো। দেখো তো কী কাণ্ড ! আমি তো বেমালুম ভুলে বসে আছি। কথায়-কথায়–'

সুমন রহমানকে কথা শেষ করতে দেয় না। মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সুমনা বলে, 'আর কথা না। তো চলুন। কোথায় যাব, যাই।'

সুমনার কথা শুনে এবার হেসে বলেন সুমন রহমান, 'বেশ তো, চলো।'

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে হাসপাতালের বাইরে গাড়িতে এসে বসে।

সুমন রহমান গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার পর সুমনা বলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি ?'

সুমন রহমান বলেন, 'দেখো না, তোমাকে কার কাছে, কোথায় নিয়ে যাই।'

সুমনা দেখে সুমন রহমানের চোখে-মুখে এতক্ষণ ধরে জমাট বেঁধে থাকা দুঃখ-কষ্ট কিচ্ছু নেই। তিনি কেমন হাসছেন !

হঠাৎ সুমন রহমান তাকে কেন এভাবে নিয়ে যাচ্ছেন, কোথায়ই বা নিয়ে যাচ্ছেন, কিচ্ছু বুঝতে পারে না সুমনা।

গাড়ি গুলশানের একটা বাড়িতে এসে ঢোকে।

সুমন রহমান প্রথমে গাড়ি থেকে নামেন। গাড়ি থেকে নেমে তিনি বলেন, 'এসো, সুমনা। এসো।'

সুমন রহমানের এ কথার পর সুমনাও গাড়ি থেকে নামে। নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখে।

প্রায় পনেরো-বিশ কাঠা জায়গার ওপর একতলা একটা বাড়ি। বাড়ির সামনে সবুজ লন। লনের চারপাশ ঘিরে ফুলের বাগান। দেশি-বিদেশি নানান জাতের নানান ফুলের মেলা বসেছে যেন। পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর বাড়িটা দেখে যেন অবাক হয়ে যায় সুমনা।

হতচকিত সুমনাকে অবাক হয়ে ড্যাবড্যাব করে চারদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুমন রহমান হেসে বলেন, 'কী হল ? কী দেখছ এত অবাক হয়ে ?'

সুমন রহমানের কথায় হুঁশ হতেই সুমনা হেসে বলে, 'বাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর !'

অনেকক্ষণ পর স্বভাবসুলভ হা হা করে হেসে সুমন রহমান বলেন, 'তাই ?'

একমুহূর্তও দেরি করে না। সুমনা বলে, 'হ্যাঁ, তাই। তবে আমাদের গ্রামের বাড়িটাও বেশ বড়। খোলামেলা। সুন্দর। তবে আধুনিক কোনও সুযোগ-সুবিধা নেই এই যা।'

আবার একইরকম প্রাণখোলা হা হা করে হেসে সুমন রহমান বলেন, 'হয়েছে। হয়েছে। তোমার গল্প, তোমার বাড়ির গল্প, তোমার মা'র প্রতি ভালবাসা, বাবার ওপর ক্ষোভ আর একদিন শুনব। আজ তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি কেন, জানো ?'

সুমনা হেসে বলে, 'আপনি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি, এটা আপনার বাড়ি। তা কেন নিয়ে এসেছেন, বলেন ?'

সুমনার কথা শেষ হতে না হতেই সুমন রহমান বলেন, 'তোমার অনেক গল্প করেছি তো। তোমার সম্পর্কে এত গল্প শুনে কী হল কে জানে ! এ বাড়ির একজন মানুষের বড় সাধ হল, তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে। তাই তোমাকে এভাবে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলাম।'

মিষ্টি হেসে সুমনা বলে, 'জোর করে আনেননি। আমি নিজেই এসেছি। তা কার এত ইচ্ছে হল আমার সঙ্গে পরিচিত হতে, বলুন তো ?'

সুমনার এ কথার পর সুমন রহমান হেসে বলেন, 'চলো। ভেতরে চলো। ভেতরে গেলেই দেখতে পাবে, কে তোমার পথের পানে চেয়ে আছে।'

একথার পর সুমনা কী ভেবে আর কথা বাড়ায় না।

পাশাপাশি হেঁটে দু'জনে লিভিংরুমে গিয়ে ঢোকে।

লিভিংরুমে ঢুকেই সুমন রহমান বলেন, 'তুমি বসো, সুমনা। আমি আসছি।'

সুমনা সোফায় বসতেই সুমন রহমান হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে চলে যান।

সুমন রহমান চলে যেতেই সুমনা লিভিংরুমের চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে।

একেবারে সাদা প্লাস্টিক পেইন্টে রং করা ঝকঝকে-তকতকে দেয়াল। দেয়ালে শিল্পী শাহাবুদ্দীনের চারটি শিল্পকর্ম। মেঝেতে বেশ নরম দামি কার্পেট। হলঘরের মতো বিশাল লিভিংরুমের চারদিকে একইরকমের নিপুণ কারুকাজ করা মোট আট সেট দামি বিদেশি সোফা।

চারদিকে একবার হালকা চোখ বুলিয়েই যেন মুগ্ধ হয়ে যায় সুমনা। আভিজাত্য, অর্থ এবং রুচি তিনটে যেন মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে সাজানো-গোছানো লিভিংরুমের দেয়ালে, মেঝেতে, সর্বত্র। অবাক হয়ে দেখে সুমনা, বিশাল লিভিংরুমের চারপাশে চারটে বড়-বড় ঝকঝকে পিতলের সুন্দর কারুকাজ করা ফুলদানী। ফুলদানীগুলোতে সাজানো রয়েছে সুগন্ধী সব তাজা ফুল।

সুন্দর দেখলে কার না ভাল লাগে ! সব দেখে-শুনে মনটা তাই ভরে যায় তার।

সুমনার এটা-ওটা কত কী ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই সুমন রহমান আবার হন্তদন্ত হয়ে লিভিংরুমে এসে ঢোকেন। এসেই বলেন তিনি, 'যে পরিচিত

হতে চায়, সে তো আর আসতে পারবে না। তাই তোমাকেই আমার সঙ্গে ওর কাছে যেতে হবে মা।'

জন্মের পর থকে বাবার স্নেহ-ভালবাসা পায়নি। পেয়েছে অবহেলা। মা শব্দটা তাই অন্তরের ভেতরে গিয়ে বাজে। তাই দ্রুত বলে সুমনা, 'আমাকে মা ডাকলেন আপনি !'

চকিতে মুখ তুলে তাকান। নিজের অজান্তেই মা বলে ফেলেছেন। তাই দ্রুত বলেন সুমন রহমান, 'কেন ! মা বললে তোমার কোনও আপত্তি আছে, বলো ! ঠিক আছে। তোমার যদি আপত্তি থাকে তো–'

আর বলতে পারেন না সুমন রহমান। মুখ থেকে ঈগলের মতো ছো মেরে কথা কেড়ে নিয়ে সুমনা বলে, 'কে বলেছে আপত্তি আছে আমার ! কেন ভাল লেগেছে বলতে পারব না। তবে আমার ভাল লেগেছে। আপনার মুখে মা ডাক শুনে, বিশ্বাস করুন, ভাল লেগেছে আমার।'

সুমনার একথা শুনে সুমন রহমানের মন-প্রাণ যেন কানায়-কানায় ভরে যায়। নিজেই বুঝতে পারেন, অপরিসীম খুশিতে চোখ দুটো দ্রুত জলে ভরে উঠেছে তাঁর। অশ্রু লুকিয়ে এবার কোনওমতে বলেন তিনি, 'গুড। ভেরি গুড। তাহলে এখন থেকে মা বলার অনুমতি পেয়ে গেলাম। কী বলো ?'

সুমন রহমানের কথা শেষ হতে না হতেই সুমনা মিষ্টি হেসে বলে, 'তা এখানে বসেই শুধু গল্প করব, না অন্য কারও সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবেন, বলুন তো ?'

মাত্র সোফায় বসেছিলেন। দ্রুত ওঠে সুমন রহমান বলেন, 'ছি ! ছি ! দেখ তো কী কাণ্ড ! একজন তোমার পথ চেয়ে আছে, আর আমি কি না কত কী নিয়ে তোমার সঙ্গে খোশগল্প করছি। তো চলো। ভেতরে যাই সুমনা, চলো।'

সুমন রহমানের পেছন-পেছন সুমনা লিভিংরুম, ডাইনিং পেরিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢোকে।

আর ঢুকেই হালকা চোখ বুলায়। দেখে, দেয়াল জুড়ে সেগুন কাঠের নিপুণ কারুকাজ করা দামি ক্যাবিনেট। ড্রেসিং টেবিল। একটা দামি খাট এবং খাটের পাশে একসেট দামি বিদেশি সোফা।

খাটে শুয়ে আছেন পুতুলের আদলে গড়া এক অনিন্দ্য সুন্দর রমণী। চোখ যেন আর সরাতে পারে না। সুমন রহমান অবশ্য আগেই বলেছেন, তিলতিল করে গড়া এক সুন্দর ! কিন্তু এত সুন্দর ভাবতেও পারেনি সুমনা।

তার মাও শুধু সুন্দরী নয়, পরীর মতো সুন্দরী। স্বভাবতই সুমনার মনে

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, কে বেশি সুন্দর ? খাটে শায়িত এই পঙ্গু রমণী, না তার মা ?

প্রশ্নটা নিয়ে ভেতরে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঠিকই। কিন্তু কে বেশি সুন্দরী, বুঝে উঠতে পারে না।

বিছানায় শুয়ে মহিলা বিড়বিড় করে কী যেন বলেন, কিন্তু এত আস্তে বলেন যে, সুমনা কিছুই বুঝতে পারে না। সে স্বভাবতই সুমন রহমানের দিকে তাকায়।

সুমন রহমান বলেন, 'জোরে কথা বলতে পারে না তো, তোমাকে কাছে গিয়ে সোফায় বসতে বলেছে।'

সুমনা কেন যেন সোফায় নয়, খাটে মহিলার মাথার কাছে গিয়ে বসে বলে, 'আপনি ভাল আছেন ?'

একমুহূর্ত দেরি না করে সূচনা আস্তে-আস্তে বলেন, 'তোমার নাম সুমনা, তাই না ?'

দ্রুত বলে সুমনা, 'হ্যাঁ। সুমনা।'

সূচনা এবার বলেন, 'তোমার এত কথা শুনে তোমার একটা ছবি কিন্তু আমি আমার মনের মধ্যে এঁকে রেখেছিলাম। এখন দেখছি, তুমি তা নও।'

হতচকিত সুমনা দ্রুত বলে, 'কেন ! কী হয়েছে !'

সূচনা ধীরে-ধীরে বলেন, 'এখন দেখছি তুমি আমার মনের মধ্যে আঁকা সেই ছবির মেয়েটির চেয়েও সুন্দর। এত সুন্দর তুমি ! আমি তো ভাবতেও পারিনি !'

প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে ! সুমনারও ভেতরটা তাই অন্তহীন এক খুশিতে ভরে যায়। সে তাই হেসে বলে, 'আপনার চেয়ে সুন্দরী নই নিশ্চয়ই।'

আস্তে-আস্তে সূচনা বলেন, 'আমি পরী দেখিনি। বিশ্বাস করো, তোমাকে দেখে মনে হল, তুমি পরীর মতো সুন্দর।'

সে নারী। রূপের প্রশংসা শুনতে তার ভাল লাগবে না তা কী করে হয় ! তাই অপরিসীম খুশিতে হেসে সুমনা এবার বলে, 'সুন্দরী, না ছাই ! বাংলা ঙ, বুঝেছেন ? বাংলা ঙ !'

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'জনের কথা শুনছিলেন সুমন রহমান। এবার স্বভাবসুলভ হা হা করে খানিক হেসে তিনি বলেন, 'আমি বলি কী, তোমাদের দু'জনের কথাই একশ' ভাগ খাঁটি। তোমরা কেউ অসুন্দর নও। দু'জনেই যাকে বলে, বিশ্বসুন্দরী।'

সুমন রহমানের কথা শেষ হতেই সূচনা এবার বলেন, 'তুমি খেয়ে যাবে মা।'

মা শব্দটা যেন কানের কাছে মধুর এক সুর তুলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। মহিলাকে দেখে, কথা বলে এমনিতে ভাল লেগেছে সুমনার। মহিলার মুখে হঠাৎ মা সম্বোধন শুনে অপরিসীম ভাল লাগায় যেন তার ভেতরটা উথাল-পাথাল হয়ে যায় ! অন্তহীন খুশিতে তাই সে হেসে বলে, 'আমাকে আপনি মা বললেন !'

সূচনা আস্তে-আস্তে বলেন, 'বারে, তুমি তো আমার–'

কথা শেষ করতে পারেন না সূচনা। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুমনা বলে, 'আমার মেয়ের মতো, তাই না ?'

সূচনা বলেন, 'হ্যাঁ। তাই। মেয়ের মতো।'

সুমনার যে কী হয় তা সে নিজেও বুঝতে পারে না ! জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হেসে সে বলে, 'এক হাতে কখনও তালি বাজে না, জানেন তো ?'

সুমনার এ প্রশ্নের উত্তরে সূচনা কিছু বলার আগেই সুমন রহমান হা হা করে হেসে বলেন, 'আরে ধ্যাৎ, এক হাতে কখনও তালি বাজে, শুনেছে নাকি কেউ !'

সুমন রহমান থামতেই সূচনার একটা হাতের ওপর নিজের হাত রেখে সুমনা এবার বলে, 'আমি আপনার মেয়ের মতো হলে, আপনিও আমার মা'র মতো। ঠিক কি না, বলেন আপনি ?'

এবারও সূচনা কিছু বলার আগেই সুমন রহমান বলেন, 'ঠিক মানে, একশ'বার ঠিক। হাজার বার ঠিক। তবে হ্যাঁ, আমিও কিন্তু তোমার বাবার মতো। ঠিক কি না, বলো তুমি ?'

সুমন রহমানের কথা শুনে সুমনা হেসে বলে, 'প্রশ্ন করে উত্তর জানার কোনও দরকার নেই। হ্যাঁ। আপনিও আমার বাবার মতো।'

ব্যস, এবার আর অল্পস্বল্প শব্দ করে হাসেন না। বেশ শব্দ করে হেসে সুমন রহমান বলেন, 'আজ রাতে যে তুমি এখানে খাবে, সে আদেশ কিন্তু আমার নয় মা।'

কথার মধ্যে এতক্ষণ কথা বলতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ পর সূচনা এবার বলেন, 'তুমি আসবে বলে অনেকদিন পর, বাবুর্চিকে কী রান্না হবে না হবে আমিই বলেছি। তুমি কিন্তু খেয়ে যাবে মা।'

সূচনা থামতেই মিষ্টি হেসে সুমনা বলে, 'ঠিক আছে। আপনার আদেশ

শিরোধার্য। আমি খেয়ে যাব, হল তো ?'

আবার বেশ শব্দ করে হেসে সুমন রহমান বলেন, 'গুড। ভেরি গুড।'

সূচনা এবার ধীরে-ধীরে বলেন, 'তোমার মা'র নাম উপমা, তাই না মা ?'

সূচনা বলে, 'জি। আমার মা'র নাম উপমা। কিন্তু কেন, বলুন তো ?'

সূচনা বলেন, 'ধরো, কোনও কারণ নেই। এমনি জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের বাড়ি কোথায় মা ?'

একমুহূর্ত দেরি না করে সুমনা বলে, 'কুমিল্লায়।'

কী ভেবে সূচনা আবার বলেন, 'কুমিল্লায় কোথায় মা ?'

সুমনা বলে, 'লাকসাম।'

সূচনা আবার বলেন, 'গ্রাম ?'

সুমনা বলে, 'গ্রামের নাম রাখালিয়া।'

ভয়ানক চমেক ওঠেন ! চমকে উঠে সুমন রহমান বলেন, 'কোথায় ! কোথায় বললে তুমি মা !'

সুমন রহমানকে এত অবাক হতে দেখে সুমনাও অবাক না হয়ে পারে না। সে তাই বলে, 'কেন, কী হয়েছে, বলুন তো ! আমাদের রাখালিয়া গ্রামের কাউকে আপনি চেনেন নাকি !'

সুমনার এ প্রশ্ন শুনে হতচকিত সুমন রহমান আমতা-আমতা করে কোনওমতে বলেন, 'সে কথা থাক। রাখালিয়া গ্রামের কোন বাড়ি তোমাদের, বলো তুমি !'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভাবতে হয় না। সুমনা তাই দ্রুত বলে, 'বাড়ির নাম, চৌধুরী বাড়ী। কেউ-কেউ আবার জমিদার বাড়িও বলেন। চৌধুরী বাড়ি বা জমিদার বাড়ি বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ, এখন আর জমিদারী ঐতিহ্যের মিথ্যে অহংকার ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে আশ-পাশের বিশ-পঞ্চাশ গ্রামের মধ্যে আর কারও জমিদারী ছিল না বলে কি না কে জানে, প্রজা লুণ্ঠনের টাকায় আশ-পাশে এতবড় বাড়িও আর গড়ে ওঠেনি।'

মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও এত অবাক হতেন কি না কে জানে ! চোখের সামনের পৃথিবীটাই যেন নিমিষে দুলে ওঠে ! ঘটনার আকস্মিকতায় সুমন রহমান যেন থ' হয়ে যান ! কী বলবেন না বলবেন আর কিছুই বুঝতে পারেন না তিনি।

বুঝতে বাকি থাকে না তাঁর, কেন এত মিল ! মা-মেয়ে না হলে, এত

মিল হতে পারে কখনও !

কাঁদলে দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে সূচনার। দুঃখের এই একটাই বহিঃপ্রকাশ তাঁর। তবে হাসতে পারেন না। তাই চোখের জল দেখে দুঃখ বোঝার উপায় থাকলেও, আনন্দ বোঝার কোনও উপায় নেই। সূচনা অবশ্য বলেছিল, 'চেহারার এত মিল। দেখো, ও নিশ্চয়ই তোমার উপমার মেয়েই হবে।'

সূচনার কথা ঠিক হয়েছে দেখে সে খুশি হয়েছে কি না, চোখ-মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই বলে, বুঝতেও পারেন না সুমন রহমান।

হতবাক সুমন রহমান ঘটনার আকস্মিকতায়, কতক্ষণ যে ফ্যালফ্যাল করে সুমনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন খেয়াল নেই ! ছেলে সবুজ হৈ চৈ করে ঘরে এসে ঢুকতেই বোধহয় খেয়াল হয়।

সবুজ রুমে ঢুকতে-ঢুকতেই চিৎকার করে বলে, 'মা, মাগো, এই মা, তুমি কেমন আছ, বলো তো ?'

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্যে হলেও হা হা করে হেসে সুমন রহমান বলেন, 'এই হচ্ছে আমাদের সবেধন নীলমণি একমাত্র সন্তান, সবুজ। তবে নাম সবুজ না হয়ে, অবুঝ হলেই বোধহয় ভাল হত। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে, সুদূর লন্ডন থেকে এফআরসিএস পাশ করে এসেছে এই ক'দিন আগে। কিন্তু কী অদ্ভুত কাণ্ড দেখো, বাড়ি ফিরেই মা, ওমা, এই মা, বলে ভ্যা-ভ্যা করে চেঁচাতে-চেঁচাতে মা'র আঁচলের তলায় এসে বসবেই। যেন কচি খোকা ! রোজ অনবরত আমি কানের কাছে, একটা বিয়ে কর, একটা বিয়ে কর বাবা বলে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে যাচ্ছি। কিন্তু কে শোনে কার কথা ! বলে কি না, বনলতা সেনের পাখির নীড়ের চোখের মতো চোখের তেমন একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হোক, তারপর দেখা যাবে। তা হ্যাঁ মা, কোথায় বনলতা সেনের মতো মেয়ে পাওয়া যায়, বলতো ! আমি এক্ষুণি গিয়ে হিড়হিড় করে টেনে এনে ফট্ করে ওর শুভ কাজটা সেরে ফেলি। সবুরে মেওয়া ফলে শুনেছি। এ তো মেওয়া কী, কচুও ফলছে না।'

সুমন রহমানের কথা শেষ হতেই সবুজ এই প্রথম ঘরে ঢুকে সুমনার দিকে তাকায়। তাকিয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে যায় সে। এত সুন্দর ! মনে-মনে যেন এরকম একটি মেয়েকেই সে খুঁজছিল। মুগ্ধ দু'টি চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে সবুজ বলে, 'আপনিই সুমনা, তাই না ?'

কথা বলে তখনও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সবুজ। দুটো আগুনে

ঝলকানো মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে সুমনা এবার কী বলবে না বলবে বোধহয় বুঝতে পারে না। আমতা-আমতা করে সে তাই কোনওমতে কেবল বলে, 'হ্যাঁ। আমিই সুমনা। কিন্তু কী করে বুঝলেন !'

মিষ্টি হেসে সবুজ বলে, 'এটুকু বোঝার জন্যে খুব বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হয় না। বাবা আপনাকে মা বলেছেন। বাবার মুখে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। সরল অংকের মতো বলে দেয়া যায়, বাবা এই দুনিয়ায় আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই মা বলতে পারেন না।'

কথা বলে সবুজ থামে।

সবুজ থামলেও কী ভেবে সুমনা বা কেউ কিছু বলে না।

সবুজই আবার বলে, 'আজ এ বাড়িতে আপনি আসবেন। সকাল থেকেই তার মহা ধুমধাম চলছে। মা তাই বিছানায় শুয়েই বহুদিন পর বাবুর্চিকে ডেকে রান্নার আয়োজন করতে বলেছেন। এছাড়া মা'র শোবার ঘর পর্যন্ত যে-সে তো আর আসতে পারে না। যার-তার তো আর প্রবেশ নেই ! তাছাড়া–'

সবুজকে কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে সুমনা বলে, 'কী হল ! থেমে গেলেন যে ! তাছাড়া কী, বলুন !'

সুমনার এ কথার উত্তরে সবুজ কিছু বলার আগেই সুমন রহমান বলেন, 'তোমরা দু'জনে না হয় লিভিংরুমে বা ছাদে গিয়ে বসে গল্প করো মা।'

সুমন রহমানের কথা শুনে সবুজ ভেতরে-ভেতরে বেশ খুশি হয়ে বলে, 'চলুন না, ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি।'

এ আহ্বানে কী ছিল কে জানে ! সুমনাও বলে, 'চলুন। যাই।'

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠে, ছাদে রাখা মুখোমুখি দুটো দোলনায় বসে।

সুমনাই প্রথমে বলে, 'তখন কিন্তু তাছাড়া পর্যন্ত বলেই কেন যেন থেমে গিয়েছিলেন আপনি।'

দোলনায় মৃদু দোল খেতে-খেতে সবুজ বলে, 'হ্যাঁ, তাছাড়া পর্যন্ত বলে বাবা-মা'র সামনে বলতে পারিনি। থেমে গেছি।'

সবুজের কথা সুমনার বোঝার কথা নয়, বুঝতে পারেও না। সে তাই বলে, 'কেন ! কী হয়েছে ! বলতে পারলেন না কেন !'

দোলনায় দোল খেতে-খেতে সবুজ বলে, 'ঠিক আছে। অভয় দেন তো বলি ?'

দ্রুত বলে সুমনা, 'বেশ তো, বলুন ?'

দু'ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি এক চিলতে হাসি ছড়িয়ে সবুজ বলে, 'বাবার মুখে এত বার শুনে আপনি যে কুৎসিত নন, সুন্দরী, এটা আমি মোটামুটি ধরেই নিয়েছিলাম।'

কথা শেষ হয় না সবুজের। তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে সুমনা হেসে বলে, 'আপনার মোটামুটি ধারণাটা মোটামুটি ঠিক হল না। একথাটা মোটামুটি বলা যায়, তাই তো?'

একমুহূর্তও দেরি করে না। সবুজ বলে, 'কিন্তু আপনি যে এত সুন্দর, আমি ভাবতেও পারিনি, জানেন! আমার মাথা তো এখনও আপনাকে দেখে চরকির মতো বন্‌বন্ করে ঘুরছে। আরে বাপ্, এ তো একেবারে ফুলপরী, নীলপরী, জলপরী, সব ফেল!'

ভাল লাগে! ভেতরে এত খুশি ছড়িয়ে গেলেও বাইরে কিন্তু তা দেখায় না সুমনা। সবুজের কথার উত্তরে সে তাই বলে, 'থাক। আর বানিয়ে-বানিয়ে মিথ্যে বলতে হবে না। তা বাবা এতবড় ব্যবসায়ী, ডাক্তারী পড়লেন কেন! এখন এতবড় ব্যবসা দেখবে কে, বলুন তো?'

সবুজ একমুহূর্ত কী যেন ভেবে বলে, 'ব্যবসায়ীর ছেলে ডাক্তারী পড়েছি প্রথমত চিকিৎসা, দ্বিতীয়ত অর্থ, তৃতীয়ত সেবার ব্রত নিয়ে, বুঝেছেন?'

সুমনা সবুজের কথা শুনে দ্রুত বলে, 'আপনাদের তো কত টাকা, অর্থের চিন্তা আর কেন!'

সুমনার কথা সুবজের ভাল লাগে না তা নয়। তবু বলে, 'এই দুনিয়ায় টাকাই কিন্তু সব।'

একমুহূর্ত দেরি করে না সুমনা। প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ করে বলে, 'না, এই দুনিয়ায় টাকা সব নয়।'

সবুজ অবাক হয়ে বলে, 'কী বলছেন আপনি! টাকার কোনও গুরুত্ব নেই আপনার কাছে!'

সুমনা বলে, 'টাকার কোনও গুরুত্ব নেই তা নয়। কিন্তু টাকা সব তাও নয়। আপনাদের তো এত টাকা! কিন্তু কই, আপনার মা যে এ্যদ্দিন ধরে বিছানায় পাষাণ প্রতিমার মতো পড়ে আছেন, টাকা তাঁকে সুস্থ করতে পেরেছে, বলুন! টাকা অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু সব কিছু করতে পারে, এটা ঠিক নয়। কেউ যদি মরে যায়, টাকা তাকে এখনও বাঁচাতে পারে, বলুন?'

সুমনার কথা শুনে সবুজের কী হয় কে জানে! হঠাৎ একখণ্ড দুঃখের কালো মেঘ এসে ছায়া ফেলে চোখে-মুখে, সমস্ত মুখাবয়ব জুড়ে। বিষণ্ন

দু'চোখ মেলে সে বলে, 'মাকে সুস্থ করার জন্যে বাবা কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এই নিথর দেহের মাকে নিয়েও পাগলের মতো পৃথিবীর বড়-বড় সব হসপিটাল থেকে হসপিটালে ছুটেছেন।'

হঠাৎ পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে সুমনা প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে বলে, 'এখনও বিয়ে করেননি যে ?'

সবুজ বলে, 'এবার করব।'

সুমনা দ্রুত বলে, 'গুড। ভেরি গুড। তা মেয়ে পছন্দ হয়েছে ?'

সবুজ বলে, 'এতদিন ধরে হন্যে হয়ে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে যাকে খুঁজেছি, এবার বোধহয় তাকে পেয়েছি আমি।'

সুমনা বলে, 'তাই !'

সবুজ বলে, 'কিন্তু তার আমাকে পছন্দ হয়েছে কি না জানি না তো।'

কী ভেবে সুমনা এবার বলে, 'তা মেয়েটা সুন্দরী তো ?'

সবুজ একমুহূর্তও দেরি করে না। বলে, 'সুন্দরী বলে সুন্দরী ! যাকে বলে, বিশ্বসুন্দরী ! লালপরী, নীলপরীও বলতে পারেন। যেন রূপকথার পাতা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা কোনও অনিন্দ্য সুন্দরী রাজকন্যা, বুঝেছেন ?'

সুমনা তখনও বুঝতে পারে না, সবুজ কী বলছে, কাকে বলছে ! সে তাই বলে, 'বাপবাহ্ ! এত সুন্দর ! তা কী নাম সুন্দরীর ?'

মাথা নিচু করে একমুহূর্ত ভাবে সবুজ ! তারপর বলে, 'তার নাম, সুমনা।'

ব্যস ! খুশি ! খুশি ! খুশি ! হাজারো খুশি যেন ছড়িয়ে যায় সুমনার প্রতি ফোঁটা রক্তের মধ্যে। না, অনেক চেষ্টা করেও কেন যেন আর কিছু বলতে পারে না সে।

এক পা-দু' পা করে সন্ধ্যা নামে।

সন্ধ্যার আবছা আলো আঁধারিতে সবুজ বলে, 'তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না সুমনা।'

সুমনা এবারও কিছু বলতে পারে না। একরাশ লজ্জা এসে ভিড় করে তার চোখে-মুখে, সর্বত্র। সে বুঝতে পারে না, কী হয়েছে তার ! এত ভাল লাগছে কেন !

আজও মনে আছে সব। কী করে ভুলবেন সুমন রহমান ! এও তো তাঁর জীবন, জীবনেরই অংশ।

শীতের এক ভোরে প্রিয় গীটার আর কাঁধে ব্যাগ নিয়ে যুবক সুমন লাকসাম জংশন স্টেশনে, ট্রেন থেকে এসে নেমেছিল। সেখান থেকে রিকশায় রাখালিয়া গ্রামে জমিদার বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই, পরীর মতো সুন্দর উপমার সঙ্গে দেখা।

জীবনে আগে আর জমিদার বাড়ি দেখেনি। তাই এত বড় বাড়ি দেখে স্বভাবতই হতবাক হয়ে যায় সে। ড্যাবড্যাব করে তাই বাড়িটার দিকে কেবল তাকিয়ে থাকে।

উপমাকেও তাই প্রথমে চোখে পড়ে না তার।

উপমা বাড়ির সামনে এক অজানা-অচেনা যুবককে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যায়। তাই বলে সুমন যে তার দিকে তাকিয়ে দেখে তা নয়। সে একইরকম হতবাক হয়ে ড্যাবড্যাব করে বিশাল জমিদার বাড়িটার দিকেই কেবল তাকিয়ে থাকে।

উপমা বলে, 'আরে, এ যে দেখছি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ! এর হল কী ! এই যে মিস্টার, শুনুন !'

উপমার কণ্ঠ কানে যায়। উপমার কণ্ঠ কানে যেতে স্বভাবতই হুঁশ হয়। সুমন তাই দ্রুত বলে, 'ইয়ে মানে, আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন ?'

সুমনের কথা শুনে উপমা ঝরণার মতো কলকল করে হেসে ওঠে। খানিক হেসে সে বলে, 'জি, জনাব। আপনাকে। আপনাকেই বলছি। তাছাড়া এখন আপনি আর আমি ছাড়া এখানে কেউ নেইও যে অন্য কাউকে বলব। বলুন, আছে কেউ ?'

পুতুলের মতো সুন্দর মেয়েটাকে দেখে যেন অবাক হয়ে যায় সুমন ! এ যেন রূপকথার কোনও রাজকন্যা ! হঠাৎ পথ ভুলে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ! এত সুন্দর সত্যি আগে কখনও দেখেনি সে ! হতবাক হয়ে তাই পরীর মতো সুন্দর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'জি। আমার মনে হয়, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। এখানে এখন আপনি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। তাই আমাকে ছাড়া আর কাকে বলবেন আপনি ! পাখি, গাছ, মাটি এসবের সঙ্গে তো আর কথা বলা যায় না। কথা বলতে হয় মানুষের সঙ্গেই।'

একমুহূর্ত দেরি না করে উপমা বলে, 'তা কে আপনি ? কোথা থেকে এসেছেন, বলুন তো ?'

সুমন বলে, 'বলব। হ্যাঁ, সব বলব। কিচ্ছু গোপন করব না। তাছাড়া সব খুলে বলব বলেই তো সেই সুদূর ঢাকা থেকে এতদূর ছুটে এসেছি আমি, বুঝেছেন ?'

উপমা সুমনের কথা শেষ হতে না হতেই বলে, 'একদিকে বলছেন, গোপন করব না। অন্যদিকে আবার গোপনই করছেন। বলছেন না। তো বলুন, ঝটপট বলুন, কে আপনি ? কার কাছে এসেছেন ? কোথা থেকে এসেছেন ?'

মিষ্টি একটুকরো হাসি ছড়িয়ে সুমন বলে, 'আমাকে দেখে কি চোর-ডাকাত মনে হচ্ছে আপনার ? পুলিশের মতো এত জেরা করছেন কেন, বলুন তো ? তাছাড়া একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে গুলিয়ে ফেলব না আমি, বলেন ?'

অবাক হয়ে উপমা বলে, 'ঠিক আছে। এত প্রশ্ন নয়। একটা প্রশ্নেরই না হয় উত্তর দিন, কে আপনি ?'

সুমন বলে, 'জি, না। এখন না। এখন ওসব থাক। আগে বাড়িতে যাই। খাওয়া-দাওয়া করে টানা একটা ঘুম লাগাই। তারপর বিকেলে চা খেতে-খেতে না হয় আপনার সঙ্গে সব গল্প করা যাবে।'

উপমা হেসে বলে, 'তাই নাকি ?'

সুমন বলে, 'জি। তাই।'

উপমা সুমনের কথা শুনে জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হাসে। হেসে ব্যঙ্গ করে বলে, 'বাড়িতে যাবেন। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমাবেন। বিকেলে চা খেতে-খেতে খোশগল্প করবেন। বাহ্, চমৎকার তো !'

একমুহূর্ত দেরি করে না। সুমন বলে, 'চমৎকার না, বলেন ? আমি

আবার সব কিছু গুছিয়ে বা প্ল্যান মতো করে থাকি। প্ল্যান ছাড়া একেবারে কিচ্ছু করি না। ভাল না, বলেন ?'

উপমা আবার হাসে। হেসে বলে, 'বাহ্ ! সুন্দর ! প্ল্যান মতো বাড়িতে ঢুকবেন ! খাবেন ! ঘুমাবেন ! গল্পস্বল্প করবেন !'

উপমার বিদ্রূপ সুমন বোঝে না বোঝে কে জানে ! সে একইরকম বলে, 'জি। ট্রেন জার্নির ধকল তো আর কম যায়নি।'

লোকটার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না উপমা। সে তাই বলে, 'বাড়িতে ঢুকবেন বুঝলাম। তা বাড়িতে ঢুকতে দিলে তো ঢুকবেন !'

কথাটা স্বভাবতই ভাল লাগে না। সে তাই বলে, 'কী বললেন ! কী বললেন আপনি !'

উপমাও দেরি করে না। বলে, 'আমি মাতৃভাষা বাংলায় বলছি। আপনি শুনতে পাননি তাও নয়। আমার মনে হয়, আপনি শুনতেও পেরেছেন। সুতরাং আর একবার কথাটা বলার দরকার আছে বলে আমি কিন্তু মনে করি না।'

বেশ রেগে যায় সুমন। দাঁতে দাঁত্ চেপে সে কোনওমতে এবার বলে, 'আমাকে দেখে কী মনে হয় আপনার ? খুব হাবাগোবা একটা ছেলে, না ? শুনুন, আমার কিন্তু খুব রাগ। আর রেগে গেলে–'

'রেগে গেলে' পর্যন্ত বলে আর বলতে পারে না সুমন। থেমে যায়।

সুমনকে থেমে যেতে দেখেই উপমা বলে, 'কী হল ! থেমে গেলেন যে ! রেগে গেলে কী, বলুন !'

উপমার কথা শুনে যে দেরি করে তা নয়। দ্রুত বলে সুমন, 'রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না আমার।'

সুমনের কথা শেষ হতেই উপহাস করে উপমা বলে, 'তাই নাকি !'

উপমার কথা বোধহয় পুরোপুরি শেষও হয় না, সুমন বলে, 'জি, তাই। রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হাতের কাছে যাকেই পাই তাকেই কিল, ঘুষি মারতে থাকি। এটা আমার একটা অভ্যাসই বলতে পারেন।'

সুমনের একথা শুনে উপমা মুচকি হেসে বলে, 'হয়নি। হয়নি। ভুল বলেছেন। অভ্যাস না বলে, বরং বলুন বদঅভ্যাস।'

উপমার কথা শোনে না শোনে কে জানে ! সুমন বলে, 'আর একটা কথা। মেয়েছেলে বলে যে চুপ করে থাকব তা ভাববেন না। রেগে গেলে কে ছেলে, কে মেয়ে, ওসব জ্ঞান আমার থাকে না। এছাড়া–'

'এছাড়া' পর্যন্ত বলে সুমনকে থেমে যেতে দেখে উপমা বলে, 'এছাড়া কী, বলুন ! থামলেন কেন !'

সুমন একমুহূর্ত কী যেন ভাবে ! ভেবে বলে, 'এছাড়া আমি কুংফু-কারাটিও জানি। আমি ব্ল্যাক বেল্টও পেয়েছি, জানেন ?'

উপমা হেসে বলে, 'ওমা, আপনি ব্ল্যাকবেল্টও পেয়েছেন ! মাগো, আপনার এত গুণ ! আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

এবারও উপমার পরিহাস করে বলা কথা বুঝতে পারে কি না কে জানে ! সুমন বলে, 'তাছাড়া আমি তো আর পানিতে ভেসে আসিনি। আমি তো আর ফেলনা কেউ নই। আমি হচ্ছি গিয়ে, যাকে বলে–'

'যাকে বলে' পর্যন্ত বলে কেন যেন আর বলে না সুমন। থেমে যায়।

সুমনকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে উপমা বলে, 'আ-হা, আমি তো সে কথাই জানতে চাচ্ছি। আপনি কে ?'

উপমার কথা শুনে সুমন বলে, 'বলব। হ্যাঁ, সব বলব। আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত। একটু জিরিয়ে নিই। খাওয়া-দাওয়া করি। তারপর না হয় সব খুলে বলব। চলি, কেমন ?'

কথা বলে যে আর অপেক্ষা করে তা নয়। কথা বলতে-বলতেই সুমন বাড়িতে ঢুকে যায়।

উপমা কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে তাই কেবল ছেলেটার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

বাড়িতে ঢুকে জমিদার বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে রাজা চৌধুরীকে দেখেই, সুমন পা ছুঁয়ে দ্রুত সালাম করে।

চেনা নেই, জানা নেই, এমন একটা ছেলেকে হঠাৎ পা ছুঁয়ে সালাম করতে দেখে রাজা চৌধুরী বলেন, 'আরে, আরে, এ কী করছেন আপনি ! আপনাকে তো আমি ঠিক–'

কথা শেষ করতে পারেন না রাজা চৌধুরী। মুখ থেকে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে সুমন বলে, 'চিনতে পারছেন না, এই তো ?'

রাজা চৌধুরী স্বভাবতই বলেন, 'হ্যাঁ। চিনতে পারছি না। কোথাও দেখেছি বলেও তো মনে হয় না।'

রাজা চৌধুরীর কথা শুনে সুমন বলে, 'চেনা-জানা হওয়ার আগে বলেন, আমাকে আপনি বলার কারণ কী ? কেন আমাকে এভাবে আপনি-আপনি করছেন ?'

সুমনের একথা শুনে রাজা চৌধুরী বলেন, 'ইয়ে মানে, বলছিলাম কী, আমি তো আপনাকে–'

মুখের কথা শেষ করতে পারেন না রাজা চৌধুরী। কথার মাঝখানে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুমন বলে, 'জি। বলবেন। আমাকে আপনি তুমিই বলবেন। কিছুতেই আর আপনি বলবেন না, বুঝেছেন ?'

সুমনের একথার পরও রাজা চৌধুরী আমতা-আমতা করে বলেন, 'কিন্তু–'

এবারও কিন্তু বলতে পারেন না। এবারও রাজা চৌধুরীকে থামিয়ে দিয়ে সুমন বলে, 'আগে তো আমাকে আপনি তুমি বলতেন। কি, বলতেন না, বলেন ?'

হতবাক হয়ে যান রাজা চৌধুরী ! বিস্ময়ের যেন সীমা থাকে না তাঁর ! একেবারে অপরিচিত একটা মুখ। কখনও দেখেছেন বলেও মনে পড়ে না। বলছে কি না তিনি নাকি তাকে তুমি বলতেন ! হতবাক হবেন না তো কী ! তিনি তাই বলেন, 'আগে আমি তোমাকে তুমি বলতাম, একথা কী বলছ তুমি !'

রাজা চৌধুরীর কথা শেষ হতেই সুমন হেসে বলে, 'সে কথা না হয় এখন থাক। পরে সব বলব।'

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না রাজা চৌধুরী। হতবাক হয়ে তিনি তাই বলেন, 'তা তুমি কোথা থেকে এসেছ, বলতো ?'

কথা বোধহয় শেষও হয় না রাজা চৌধুরীর, সুমন হেসে বলে, 'হবে, বুঝেছেন ? সব হবে। ধীরে-ধীরে সব আপনাকে খুলে বলা হবে। এত উদগ্রীব হচ্ছেন কেন, বলুন তো !'

ভেতরে-ভেতরে যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে বৃদ্ধ এবার বলেন, 'আমি উদগ্রীব হয়েছি কে বলল তোমাকে ?'

সুমন মিষ্টি হাসে। মিষ্টি হেসে বলে, 'জি, না। কেউ বলেনি। আমি নিজেই বুঝতে পেরেছি।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে রাজা চৌধুরী বলেন, 'তা তুমি এখানে কেন এসেছ, বলো !'

সুমন একইরকম মিষ্টি হেসে বলে, 'বলেছি তো, বলব। সব খুলে বলব। আগে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে মুখে কিছু দিয়ে নিই, তারপর একটা ঘুম লাগাই। সারা রাতের ট্রেন জার্নি। কম ধকল তো আর যায়নি বেচারা

শরীরের ওপর দিয়ে।'

রাজা চৌধুরীর বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটে না ! তিনি বলেন, 'ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে এসেছ ! তা তুমি কি এখানেই থাকবে নাকি !'

একমুহূর্ত দেরি করে না। সুমন বলে, 'জি। থাকব। এখানেই থাকব।'

রাজা চৌধুরীর বিস্ময়ের যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না ! কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কী নাম, কী পরিচয়, কিছুই জানেন না ! কিন্তু এখানে থাকবে বলে ঠিকঠাক করেই এসেছে ! হতবাক রাজা চৌধুরী তাই বলে, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে ঠিক–'

মুখের কথা শেষ করতে পারেন না রাজা চৌধুরী। দেখেন সুমন বেশ শব্দ করে হাসছে। হতবাক বৃদ্ধ তাই বলেন, 'তুমি হাসছ যে !'

সুমন কিন্তু থামে না। একইরকম হেসে সে বলে, 'বারে, হাসার কথা বললেও হাসব না আমি !'

পূর্ব পুরুষের জমিদারী ছিল। এখন জমিদারী নেই। এখন আর তাই তাঁদের সেই দাপটও নেই। কিন্তু রক্তে সামান্যও উত্তরাধিকার পাননি তা তো আর নয়। একথা শুনে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যেতে তাই সময় লাগে না বৃদ্ধের। দাঁতে দাঁত চেপে বৃদ্ধ তাই বলেন, 'হাসার কথা বলেছি আমি ! জানো তুমি, কার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছ ! কাকে কী বলছ তুমি !'

রাজা চৌধুরীকে রাগে গড়গড় করতে দেখেও সুমনের হাসি যে থামে তা নয়। সে একইরকম হেসে বলে, 'রাগ করলেন ? থাকবে না। বলেছি তো, এ রাগ আপনার থাকবে না। একদম থাকবে না।'

রাগে গড়গড় করতে-করতে রাজা চৌধুরী বলেন, 'কেন ! রাগ থাকবে না কেন, বলো !'

মিষ্টি হেসে সুমন বলে, 'যখন বলব আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, তখন এই রাগ থাকবে না। গলে একদম পানি হয়ে যাবে, বুঝেছেন ?'

দাঁতে দাঁত চেপে রাজা চৌধুরী বলেন, 'বেশ তো বলো, কে তুমি ? কী তোমার পরিচয় ? কোথা থেকে এসেছ তুমি ?'

মিষ্টি এক চিলতে হাসি ছড়িয়ে সুমন বলে, 'বলেছি তো, ওসব এখন থাক। আমি খুব টায়ার্ড। এছাড়া আমার খুব খিদেও পেয়েছে। আগে গোসল করি। খাওয়া-দাওয়া কিছু করি। তারপর–'

কিছুই বুঝতে পারেন না রাজা চৌধুরী। তিনি তাই বলেন, 'তারপর কী,

বলো !'

নিঃশব্দে নয়, বেশ শব্দ করে হেসে সুমন বলে, 'তারপর সব বলব। তবে এটুকু জেনে রাখতে পারেন, আমি আপনার অতি প্রিয়, অতি কাছের একজন। এত কাছের যে বলে বোঝাতে পারব না। তাহলে যাই, কেমন ? সারা রাতের জার্নি। একটু বিশ্রাম নিই।'

কথা বলে যে আর অপেক্ষা করে তা নয়। সোজা ভেতরে চলে যায় সুমন।

রাজা চৌধুরী ঘটনার আকস্মিকতায় এতটাই হতবাক হয়ে যান যে, সুমনকে ভেতরে যেতে বাঁধা দেয়া তো দূরের কথা, কী বলবেন না বলবেন তাও বুঝতে পারেন না তিনি।

বৈঠকখানার পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত পুত্রবধূ রোকেয়া বেগম আড়ি পেতে এতক্ষণ সব শুনছিলেন। তাঁর মেয়েলি মনে স্বভাবতই সন্দেহ বাসা বাঁধে। তিনি ছুটে এসে এবার বলেন, 'বাবা, ছেলেটা কে ! কেন এসেছে ! কী চায় ও !'

পুত্রবধূর এসব প্রশ্নের উত্তরে তিনি কী-ই বা বলতে পারেন ! তিনি কি নিজেও জানেন, কেন এসেছে ! কী চায় ! বৃদ্ধ রাজা চৌধুরী তাই পুত্রবধূ রোকেয়া বেগমের এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমি তো নিজেও বুঝতে পারছি না বৌমা, কেন এসেছে ! কী চায় ও !'

রাজা চৌধুরীর কথা বোধহয় শেষও হয় না, রোকেয়া বেগম বলেন, 'অপরিচিত একটা ছেলে। বাড়িতে এসে—'

মুখের কথা শেষ করতে পারেন না রোকেয়া বেগম। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রাজা চৌধুরী বলেন, 'আমি তাকে বাড়িতে থাকতে না দিলেও পারতাম। কিন্তু ছেলেটা যখন বলল, অতি প্রিয়, আমার অতি কাছের একজন, তখন মনটা আমার সত্যি—'

শ্বশুরের কথার প্রতিবাদ না করে আর বোধহয় পারেন না। রোকেয়া বেগম তাই বলেন, 'বললেই হল, অতি প্রিয়, অতি কাছের একজন !'

চিন্তিত রাজা চৌধুরী বলেন, 'কিন্তু একথাই তো সে বলল মা।'

উৎকণ্ঠিত রোকেয়া বেগম আবার বলেন, 'বললেই হল অতি প্রিয়, অতি কাছের একজন ! ব্যস, হয়ে গেল ! মগের মুল্লুক নাকি !'

আনমনে খানিক কী ভেবে রাজা চৌধুরী বলেন, 'দেখি না মা, বিকেলে ও কী বলে। এমনও তো হতে পারে, সত্যি ও আমাদের কাছের একজন।'

কথা বোধহয় শেষও হয় না রাজা চৌধুরীর, রোকেয়া বেগম বলেন, 'চেনা নেই, জানা নেই, হঠাৎ একজন এসে বললেই হল, আমি আপনার অতি প্রিয়, অতি কাছের !'

পুত্রবধূকে উৎকণ্ঠিত হতে দেখে রাজা চৌধুরী বলেন, 'এমনভাবে বলল কথাটা, তোমাকে কী বলব বৌমা, আমি কিন্তু শেষমেষ বিশ্বাস—'

মুখের কথা মুখেই থাকে রাজা চৌধুরীর। মুখ থেকে ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে রোকেয়া বেগম বলেন, 'বিশ্বাস করে ফেললেন ? না বাবা, ছেলেটাকে এভাবে বিশ্বাস করা, বিশ্বাস করে বাড়িতে থাকতে দেয়া, কোনওটাই ঠিক হয়নি আপনার।'

সুমন বাড়ির ভেতরে যায় ঠিকই। কিন্তু এতবড় বাড়ির কোথায় থাকবে না থাকবে বুঝতে না পেরে, সে আবার ফিরে আসে। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে রোকেয়া বেগমের সব কথা শুনতেও পায়। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেই সে তাই বলে, 'আমি এ ঘরে ঢুকতে গিয়ে আপনার কথা শুনতে পেয়েছি। মানুষকে এভাবে অবিশ্বাস করা কিন্তু ঠিক নয়।'

সুমনের একথা শুনে রোকেয়া বেগম যে চুপ করে থাকেন তা নয়। তিনি বলেন, 'চেনা-জানা নেই এমন একজনকে বিশ্বাস করা কি ঠিক ! বিশ্বাস করে বাড়িতে থাকতে দেয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ ! আপনি কি বলেন ?'

সুমন কিন্তু এতটুকু রাগে না। সে মিষ্টি হেসে বলে, 'আমাকে দেখে কি মনে হয় আপনার, আমি মিথ্যে বলতে পারি !'

একমুহূর্ত দেরি করেন না। রোকেয়া বেগম বলেন, 'হ্যাঁ, পারেন। কেন পারবেন না ! মানুষই তো মিথ্যে কথা বলে।'

রোকেয়া বেগমের কথা শুনে দ্রুত বলে সুমন, 'না। ঠিক না। বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু মিথ্যে বলি না। বরং মিথ্যেকে দারুণ ঘৃণা করি আমি।'

রোকেয়া বেগমও ছেড়ে দেয়ার পাত্রী নন। তিনি ছেড়ে কথা বলেনও না। তিনি তাই বলেন, 'আপনি যে মিথ্যে বলেন না, যাকে বলে একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, তাও কিন্তু এখনও প্রমাণিত হয়নি।'

এই প্রথম বোধহয় আঘাতটা লাগে। তাই বলে যে রাগ দেখায়, হাসে না, তাও নয়। মিষ্টি হেসে সুমন বলেন, 'একটা ভদ্র ছেলেকে এভাবে বলা কি ঠিক, বলেন ?'

রাজা চৌধুরী এতক্ষণ দু'জনের কথা শুনছিলেন। সুমনের এ কথার পর তিনি এবার বলেন, 'না। তা বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু তোমার পরিচয়টা তো

জানা দরকার। কে তুমি ? কোথা থেকে এসেছ ? কেন এসেছ, বলো ?'

আনমনে মাথা নিচু করে একমুহূর্ত কী যেন ভাবে সুমন ! তারপর বলে, 'তাহলে শুনুন, আমার নাম সুমন। আমার বাবার নাম, আওলাদ হোসেন।'

সুমন থামতেই রাজা চৌধুরী বলেন, 'বুঝলাম, তোমার নাম সুমন। কিন্তু তোমার বাবা আওলাদ হোসেন কী করেন, বলো তো ?'

মাথা নিচু করে সুমন বলে, 'তিনি আর এই দুনিয়ায় নেই।'

রাজা চৌধুরী বলেন, 'ইন্নালিল্লাহ্। তা তুমি এখানে কেন এসেছ, বলো ?'

চোখে-মুখে একরাশ হাসি ঝুলিয়ে সুমন বলে, 'এখনও বুঝতে পারছেন না আপনারা !'

রাজা চৌধুরী বোধহয় কিছু বলবেন বলে মুখ খুলেছিলেন। কিন্তু তাঁকে কিছু বলতে না দিয়ে রোকেয়া বেগম বলেন, 'না বললে আমরা বুঝব কী করে, বলো !'

আবার খানিক ভাবে ! ভেবে সুমন বলে, 'উপমার বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, যাকে বলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

চোখের সামনে পৃথিবীটাই যেন নিমিষে দুলে ওঠে রোকেয়া বেগমের ! শুধু চমকে ওঠা নয়, ভয়ানক চমকে ওঠেন তিনি ! হতচকিত রোকেয়া বেগম নিজের অজান্তেই দ্রুত বলেন, 'তুমি আওলাদ ভাইয়ের ছেলে !'

অমলিন একচিলতে হাসি চোখে-মুখে ছড়িয়ে রেখে সুমন বলে, 'জি। আমি তাঁরই ছেলে। নাম সুমন।'

রাজা চৌধুরীর যেন খুশির সীমা নেই ! অফুরন্ত খুশিতে তিনি বলেন, 'তুমি সুমন ! তুমিই আমাদের সুমন !'

একইরকম মিষ্টি হেসে সুমন বলে, 'জি। আমিই আপনাদের সেই সুমন।'

অপরিসীম খুশিতে হো হো করে হেসে রাজা চৌধুরী বলেন, 'শোনো বৌমা, ও কী বলছে তুমি শোনো।'

রোকেয়া বেগমের সংশয় কিন্তু যায় না। তিনি আমতা-আমতা করে বলেন, 'কিন্তু বাবা–'

পুত্রবধূকে কথা শেষ করতে দেন না। কথার মাঝখানে রোকেয়া বেগমকে থামিয়ে দিয়ে রাজা চৌধুরী বলেন, 'আরে, রাখো তো তোমার কিন্তু। কতদিন ধরে পথের পানে তাকিয়ে বসে আছি আমি। এতদিন পর আজ ও এসেছে। আমি খুশি, বৌমা। আমি খুব খুশি।'

রাজা চৌধুরীর কথা বোধহয় পুরোপুরি শেষও হয় না, রোকেয়া বেগম বলেন, 'কিন্তু বাবা, ও যে সেই সুমন–'

কথা শেষ করতে পারেন না রোকেয়া বেগম। মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রাজা চৌধুরী বলেন, 'তুমি এখন ঘরে যাও তো বৌমা। যে সুন্দর মুখটা দেখব বলে এতদিন বেঁচে আছি, সেই সুন্দর মুখটা ভাল করে দেখতে দাও আমাকে। যাও বৌমা, তুমি ঘরে যাও।'

ব্যস, যুবক সুমনের এতবড় এই জমিদার বাড়িতে আর থাকার কোনও অসুবিধা হয় না।

কিন্তু রোকেয়া বেগমের কী হয় কে জানে ! তাঁর মন থেকে কিন্তু সন্দেহ পুরোপুরি দূর হয় না। তিনি ভাবেন, এ সুমন তো !

সকালে ঘুম থেকে উঠে রোজ বাড়ির সামনে-পেছনে হাঁটাহাঁটি করা বৃদ্ধের অনেক দিনের অভ্যাস। আজও তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজা চৌধুরী অল্প-বিস্তর হাঁটাহাঁটি করে, বাড়ির সামনে পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে বসে খানিক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

ছেলেটাকে নিয়ে এটা-ওটা কত কিছু চিন্তা করে সারা রাত ঘুমাতে পারেননি রোকেয়া বেগম। তিনি কেন যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না, এই সেই সুমন ! সকালে পুকুর পাড়ের ঘাটে শ্বশুরকে দেখে, তিনি তাই এগিয়ে এসে বলেন, 'বাবা।'

রাজা চৌধুরী পুত্রবধূকে এত সকালে পুকুর ঘাটে দেখে অবাক হয়ে বলেন, 'বলো মা ?'

খানিক আনমনে ভেবে রোকেয়া বেগম বলেন, 'আপনিই তো চিরদিন বলেছেন, আমি শুধু আপনার পুত্রবধূ নই। মেয়েও।'

একমুহূর্ত বিলম্ব না করে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে রাজা চৌধুরী বলেন, 'হ্যাঁ, তাই। তুমি শুধু আমার পুত্রবধূ নও, আমার মেয়েও।'

উৎকণ্ঠিত রোকেয়া বেগম বলেন, 'যে পুত্রবধূকে আপনি মেয়ের মতো স্নেহ করেন, তার কথা আপনি চিন্তা করবেন না বাবা ? তার সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা আপনি একবারও ভাববেন না, বলেন ?'

রাজা চৌধুরী দ্রুত বলে, 'এসব তুমি কী বলছ বৌমা ! ভাবব না মানে ! আর তুমি তোমার যে সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা বললে বৌমা, তোমার সে সন্তান আমার কী, আমার কে, বলো তুমি ?'

উদভ্রান্তের মতো রোকেয়া বেগম বলেন, 'ঐ সুমন নামের ছেলেটার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে !'

পুত্রবধূর কথা রাজা চৌধুরী বোধহয় বুঝতে পারেন না। তিনি তাই বলেন, 'বলো বৌমা, তাহলে কী, বলো ?'

উদভ্রান্তের মতো রোকেয়া বেগম বলেন, 'তাহলে ঐ সুমন নামের ছেলেটাই কি উপমার স্বামী, বলেন !'

পুত্রবধূর এত উৎকণ্ঠার কারণ রাজা চৌধুরী বোধহয় এবার বুঝতে পারেন। তিনি তাই বলেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

দিশেহারার মতো তাকিয়ে রোকেয়া বেগম বলেন, 'কী বলছেন বাবা ! কী বলছেন আপনি !'

রাজা চৌধুরীও আনমনে খানিক কী যেন ভাবেন ! বোধহয় খানিক অতীত রোমন্থন করেন তিনি ! খানিক ভেবে তিনি এবার বলেন, 'যত ছেলে বেলারই হোক না কেন, ওদের তো বিয়ে হয়েছিল বৌমা ! আইনত, ধর্মত ওরা এখন–'

মুখের কথা শেষ করতে পারেন না রাজা চৌধুরী। মুখ থেকে ঈগলের মতো কথা কেড়ে নিয়ে রোকেয়া বেগম বলেন, 'স্বামী-স্ত্রী, না ! আমি মানি না বাবা। আমি এটা কিছুতেই মানি না। আমার জীবন থাকতে মানি না।'

রোকেয়া বেগমের কথা শুনে রাজা চৌধুরীর যেন বিস্ময়ের সীমা থাকে না। হতবাক হয়ে তিনি বলেন, 'তুমি এসব কী বলছ বৌমা ! সেদিন আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিয়েছিলাম।'

উৎকণ্ঠিত রোকেয়া বেগম বলেন, 'বললেই হল, আমি সুমন ! উপমা আমার স্ত্রী ! ব্যস, হয়ে গেল ! আপনি দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন বাবা।'

পুত্রবধূর কথা রাজা চৌধুরীর ভাল লাগে না। তিনি তাই বলেন, 'তুমি এসব কী বলছ বৌমা ! তোমার মাথা ঠিক আছে তো, বলো !'

রোকেয়া বেগম কখন কেঁদে ফেলেছেন নিজেও জানেন না। কেঁদে-কেটে তিনি এবার বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না বাবা, সে নিজেকে সুমন বললেই আমরা তাকে বিশ্বাস করব কেন ?'

রোকেয়া বেগমের কথা শেষ হতে না হতেই রাজা চৌধুরী বলেন, বিশ্বাস করব নাই বা কেন বৌমা, বলো ?'

রাজা চৌধুরীর কথা শুনে উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রোকেয়া বেগম বলেন, 'এমনও তো হতে পারে বাবা, ও সুমন নয়। অন্য কেউ।'

কখন সুমন এসে পুকুর ঘাটে ওঁদের পেছনে দাঁড়িয়েছে, দু'জনের কেউ বলতেও পারবেন না। কথা শুনেই দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে দেখেন, হাসিমুখে সুমন দাঁড়িয়ে আছে। সে বলে, 'আপনি বিশ্বাস করেন না, আমি সুমন, এই তো ?'

রোকেয়া বেগম যে দেরি করেন তা নয়। তিনি দ্রুত বলেন, 'হ্যাঁ। আমি বিশ্বাস করি না, তুমি সুমন।'

একথা শুনে যে মুখ ভার করে তা নয়। মিষ্টি হেসে সে বলে, 'কথাটা আপনি ভুল বলেছেন। ঠিক বলেননি মা।'

আর যাই হোক মা ডাক শুনে ভেতরটা বোধহয় কেঁপে ওঠে রোকেয়া বেগমের। নিজের অজান্তেই পাল্টা বলেন তিনি, 'মা ! তুমি আমাকে মা বললে !'

সুমন একমুহূর্ত দেরি করে না। বলে, 'হ্যাঁ, মা। এই মুহূর্তে এ পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই, জানেন ? একমাত্র আপনি, দাদু আর–'

'আর' পর্যন্ত বলেই থেমে যায়। আর বলতে পারে না সুমন।

সুমনকে থেমে যেতে দেখে রোকেয়া বেগম বলেন, 'কী হল ! থামলে যে ! আর কী, বলো !'

রোকেয়া বেগমের কথা শেষ হতেই সুমন বলে, 'আর ঐ উপমা ছাড়া আমার আর এ দুনিয়ায় কেউ নেই মা।'

এতক্ষণ যা হোক নিজেকে ধরে রেখেছিলেন রোকেয়া বেগম। এবার আর কিছুতেই নিজেকে বোধহয় ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। উত্তেজিত হয়ে তিনি তাই বলেন, 'না, না। এ মুখে ও নাম উচ্চারণ করবে না তুমি। কিছুতেই করবে না। তোমাকে প্রথম এবং শেষবারের মতো–'

কথা শেষ করতে পারেন না রোকেয়া বেগম। কথা শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সুমন বলে, 'কিন্তু মা, ও তো আমার–'

এত উত্তেজনায়, আবেগে কেঁদে ফেলে রোকেয়া বেগম বলেন, 'তোমার বিয়ে করা বৌ, তাই না ! না, মানি না। এ আমি মানি না।'

রোকেয়া বেগমকে এভাবে কাঁদতে দেখে সুমন বলে, 'দয়া করে আপনি উত্তেজিত হবেন না, মা। প্লিজ।'

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে রোকেয়া বেগম বলেন, 'কী চাই তোমার ? টাকা-পয়সা ? ধন-দৌলত ? কত চাই, বলো ?'

ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো অমলিন হাসি ঝুলিয়ে সুমন বলে, 'আমি ভালবাসা চাই মা। বিশ্বাস করুন, আমি একটু ভালবাসার জন্যে ছুটে এসেছি। এ পৃথিবীতে এখন দাদু, আপনি আর উপমা ছাড়া আমার কেউ নেইও।'

এতক্ষণ সুমন আর রোকেয়া বেগমের কথা শুনছিলেন। এবার দু'জনের কথার মধ্যে রাজা চৌধুরী বলেন, 'তা তোমার বাবার কথা তো শুনলাম। তোমার মা কোথায় ? তিনিও–'

'তিনিও' পর্যন্ত বলে আর বলতে পারেন না রাজা চৌধুরী। থেমে যান।

রাজা চৌধুরীকে থেমে যেতে দেখে সুমন বলে, 'না, নেই। তিনিও নেই। আপনাদের মনে আছে কি না জানি না। বাবা ঢাকাতেই একটা ইন্ডাস্ট্রি কিনেছিলেন। ঢাকা চলে যাব বলে আপনাদের বাড়িতে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

সুমন থামে। সুমন থামতেই রাজা চৌধুরী বলেন, 'থামলে কেন তুমি, বলো ?'

মাথা নিচু করে খানিক কী ভেবে সুমন বলে, 'উপমার বাবা আর আমার বাবা ছিলেন বন্ধু। উপমার মা আর আমার মা ছিলেন ঘনিষ্ঠ সই।'

রাজা চৌধুরীর তর সয় না। তিনি দ্রুত বলেন, 'বলো ভাই, বলো ? তারপর কী, বলো ?'

সুমন বলে, 'যাবার সময় আপনারা সবাই কাঁদলেন। এমন কী ছোট্ট উপমাও কাঁদল। আমরাও কাঁদলাম। সে সময় আপনি কী বলেছেন, আমার তা আজও মনে আছে দাদু।'

রাজা চৌধুরী দ্রুত বলেন, 'কী বলেছি, বলো ?'

মুহূর্ত দেরি না করে সুমন বলে, 'আপনি বলেছেন, শোনো আওলাদ, সুমন কিন্তু এখন আর শুধু তোমাদের ছেলে না, বুঝেছ তুমি ? সে এখন আমার উপমারও স্বপ্ন। তোমরা ওকে কিন্তু দেখে রাখবে। মানুষ করবে।'

ব্যস, সুমনের কথা শুনে অপার খুশিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে যেতে সময় লাগে না। আনন্দের আতিশয্যে হো হো করে হেসে রাজা চৌধুরী বলেন, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ, বৌমা। ঠিক বলেছে। ঠিক বলেছে ও। এ-ই সুমন। আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, আমি বলছি এ-ই সুমন।'

মায়ের অন্তর বলে কথা। রোকেয়া বেগমের মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা কিন্তু তখনও দূর হয় না। রাজা চৌধুরীর একথার পরও তিনি তাই বলেন, 'কিন্তু বাবা, ও যে সুমন, ও যে মিথ্যে কথা বলছে না–'

মুখের কথা শেষ করতে পারেন না রোকেয়া বেগম। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রাজা চৌধুরী বলেন, 'ওরা যেদিন ঢাকা যায়, সেদিন তুমিও তো সেখানে ছিলে বৌমা। বলো, ছিলে না ? তবু তোমার চোখে-মুখে কেন এত অবিশ্বাস, বলো ? কথাগুলো কি মিথ্যে বলেছে ও, বলো তুমি ?'

রাজা চৌধুরীর এ কথার উত্তরে রোকেয়া বেগম কিছু বলার আগেই সুমন হেসে বলে, 'না, দাদু। আমি বলছি শোনেন, ওনার এখনও কেন যেন বিশ্বাস হয়নি। তবে মা, একথা জানবেন আপনি, আমি কিন্তু যা বলেছি সত্য বলেছি। একবর্ণও মিথ্যে বলিনি। আর সত্য যা তা চিরদিন সত্য। আমি

জানি, আপনিও একদিন না একদিন এই সত্যকে বিশ্বাস করবেন। তবে বিশ্বাস করতে হয়তো একটু দেরি হবে এই যা।'

সুমন দেখে রাজা চৌধুরী চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে, তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। কী ভেবে সুমন আর কথা বাড়ায় না। রাজা চৌধুরীর চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারে তিনি বোধহয় কিছু বলতে চান। রাজা চৌধুরী এরপর কী বলে তা শোনার জন্যে সে তাই দাঁড়িয়ে থাকে।

রাজা চৌধুরী যে চুপ করে থাকেন তা নয়। অন্তহীন খুশিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে তিনি বলেন, 'আরে, ওর কথা শুনে বুঝলে তো বৌমা, সত্য যা তা চিরদিন সত্য। বলছিলাম কী বৌমা, দেরি করে লাভ নেই। সুমনকে তুমি মেনে নাও। আমি একটু সুখে চোখ বুজি। উপমার কিছু না দেখে আমি যে মরতেও পারছি না বৌমা।'

রাজা চৌধুরীর কথার জবাবে রোকেয়া বেগম কী বলেন না বলেন তা শোনার জন্য আর কেন যেন অপেক্ষা করে না। সুমন বলে, 'আমি তাহলে এখন যাই দাদু। বাইরে একটু ঘুরে আসি।'

অনুমতি চায় ঠিকই। কিন্তু অনুমতি পাওয়া না পাওয়ার জন্যে আর যে অপেক্ষা করে সুমন তা নয়। জমিদার বাড়ির প্রধান ফটক দিয়ে বাইরে চলে যায় সে।

বাড়ির পাশেই নদী। একেবারে ক্ষীণস্রোতা একটা নদী। বর্ষায় জলে এপাড়-ওপাড় একাকার হয়ে যায়। শীতে নদীটার কী হয় কে জানে ! একেবারে শুকিয়ে না গেলেও, মাত্র এক হাঁটু-দু' হাঁটু জল থাকে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে'।

আনমনে অজগরের মতো এঁকেবেঁকে যাওয়া নদীটার পাড় ধরে হাঁটছিল।

শীতের সকালে চারদিকে কেউ যেন কুয়াশার চাদর বিছিয়ে রেখেছে। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা।

একটু সামনে এগোতেই দেখে উপমা উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে। বুঝতে বাকি থাকে না, সেও হাঁটতে বেরিয়েছে।

মুখোমুখি হতেই সুমন বলে, 'কেমন আছেন আপনি ?'

উপমা দ্রুত বলে, 'কেন ? আমার ভাল থাকা বা মন্দ থাকা নিয়ে আপনার কী দরকার ?'

সুমন ঘাবড়ে যায় না। ঘাবড়ে যাওয়ার মতো ছেলেও সে নয়। মিষ্টি

হেসে সে তাই বলে, 'আপনি ভাল আছেন কি না জানতে চাচ্ছিলাম, এই আর কী।'

একমুহূর্ত দেরি করে না। উপমা বলে, 'আমাকে দেখে কী মনে হয় আপনার, বলুন তো ? মন্দ আছি আমি ?'

ঠোঁটের ফাঁকে অমলিন একটুকরো মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে সুমন বলে, 'আচ্ছা, আপনি কি সব সময় এভাবে রেগে থাকেন ? রেগে থাকা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য খুব একটা ভাল নয়।'

সুমনের কথা শুনে উপমা কটমট করে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'তাই নাকি ?'

একমুহূর্ত দেরি করে না সুমন। সে বলে, 'হ্যাঁ, তাই।'

উপমা যে চলে যায় তা নয়। আনমনে একমহূর্ত কী ভেবে সে বলে, 'তা আপনি এ বাড়িতেই চিরদিন থাকবেন নাকি ! দেখে-শুনে তো মনে হচ্ছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়েছেন !'

উপমার মুখে হঠাৎ একথা শুনবে বোধহয় ভাবতেও পারেনি ! উপমার একথা শুনে মুখের হাসি-খুশি সব কোথায় উধাও হয়ে যায় কে জানে ! উপমার কথায় কষ্ট পেলেও, কষ্ট আড়াল করে বলে, 'আমি এ বাড়িতে থাকলে আপনার কোনও অসুবিধা আছে ? অসুবিধা হলে বলুন, আমি চলে যাই।'

সুমনের কথা বোধহয় শেষও হয় না। কী ভেবে উপমা এবার বলে, 'তা কে আপনি ? কোথা থেকে এসেছেন ? কিছুই কিন্তু এখনও জানা হল না।'

সুমন আবার একইরকম মিষ্টি হাসে। হেসে বলে, 'অপেক্ষা করুন, জানবেন। কে আমি, কী আমার পরিচয়, এখানে কেন এসেছি, তাছাড়া এ বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কী, সব জানবেন।'

সুমনের কথা শুনে উপমা বিদ্রূপ করে বলে, 'আরে বাপরে, এ বাড়ির সঙ্গেও আপনার সম্পর্ক আছে বুঝি ! আমি তো ভাবতেই পারছি না। বাপরে, এসব কী বলছেন আপনি !'

উপমার বিদ্রূপ করে বলা কথা বোধহয় বুকের ভেতরে গিয়ে লাগে তাই বলে যে মুখ ভার করে কথা বলে তাও নয়। মুখে একচিলতে হাসি ছড়িয়ে সুমন বলে, 'কাউকে ছোট করে কিন্তু নিজে বড় হওয়া যায় না। এ সত্যটুকুও আপনি জানেন না দেখে আমি দুঃখিত। আর হ্যাঁ, শুধু সম্পর্ক নয়। এ বাড়ির ওপর আমার কিন্তু অধিকারও আছে।'

সুমনের কথা শুনে উপমা একইরকম উপহাস করে বলে, 'তাই নাকি !

বাপরে, এ বাড়ির ওপরও আপনার তাহলে অধিকার আছে !'

উপমার এত বিদ্রূপ, এত পরিহাস করা দেখেও যে ঘাবড়ে যায় তা নয়। একইরকম মিষ্টি হেসে সুমন বলে, 'অধিকার আছে এটা সত্যি। তবে অধিকার কতটা কী আছে না আছে তা অবশ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার ওপর।'

সুমনের কথা শুনে যার-পর-নাই হতবাক হয়ে উপমা বলে, 'কী বলছেন আপনি ! এ বাড়ির ওপর আপনার কী অধিকার আছে না আছে, তা নির্ভর করছে আমার ওপর ! আপনার মাথা ঠিক আছে তো !'

উপমার কথা বোধহয় পুরোপুরি শেষও হয় না, সুমন মুচকি হেসে বলে, 'আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয় আপনার ? ছি, না। আমি পাগল নই। মাথার নাটবল্টু একটাও ঢিলা হয়নি আমার। সব ঠিক আছে, বুঝেছেন ?'

প্রশ্ন করে যে উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করে তা নয়। চলে যায় সুমন।

হতবাক হয়ে সুমনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, কেন এসেছে ও এ বাড়িতে ! কী চায় ! তাছাড়া পরিচয়টাই বা কী ওর ! উপমা কিছুই বুঝতে পারে না। সব কিছু কেন যেন কেমন রহস্যময় লাগে ওর কাছে !

সুমনেরও ঐ একই অবস্থা। সেও ঐ এক উপমাকে নিয়েই ভাবে।

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে উত্তর জানতে চায় সুমন। এত সুন্দর সে কি আর দেখেছে ? নিজেও জানে, না। দেখেনি সে। চোখ ধাঁধানো এত সুন্দর দেখে মাথাটা যেন ঘুরে যায় তার।

বুঝতে পারে, পরীর মতো সুন্দর উপমাকে একটু-একটু করে ভাল লাগতে শুরু করেছে তার।

শুধু যে ভাল লাগা তাও নয়। নিজের অজান্তেই এত সুন্দর মুখের উপমাকে বোধহয় শেষমেষ ভালও বেসে ফেলেছে সে।

ব্যস, রাতদিন এই একজনের ভাবনাই পেয়ে বসে তাকে।

উপমা ! উপমা ! উপমা !

উপমা ছাড়া যেন আর কিছু নেই !

সারাদিন ভাবে ! রাতেও বিছানায় শুয়ে ছটফট করে আর ঐ এক উপমাকে নিয়েই ভেবে-ভেবে রাত কাবার করে দেয়।

রাতে ঘুম আসছিল না। তাই গীটার নিয়ে বসেছিল। এমন হয়। ঘুম আসে না। তাই গীটার নিয়ে বসে।

তখন রাত ক'টা হবে কে জানে ! রাত দেড়টার কম নয় নিশ্চয়ই।

এসময় তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। এত রাতে কে এল, বুঝতে পারে না সুমন। দরজা খুলে দেখে, রোকেয়া বেগম দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

রোকেয়া বেগমকে দেখে সুমন স্বভাবতই অবাক হয়ে বলে, 'এত রাতে আপনি ! আসুন। প্লিজ, ভেতরে আসুন।'

রোকেয়া বেগম সুমনের পেছনে-পেছনে ঘরে ঢোকেন ঠিকই, কিন্তু ঘরে ঢুকে কেন যেন কিছুই বলেন না।

রোকেয়া বেগমকে চুপ করে থাকতে দেখে সুমনই বলে, 'এত রাতেও আপনি ঘুমাননি !'

সুমনের কথা বোধহয় শেষও হয় না, রোকেয়া বেগম বলেন, 'তুমি এ বাড়িতে আসার পর গত পনেরো দিন আমার ঘুম হয় না, জানো ? তুমি এ বাড়িতে আসার পর আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছ। আনন্দ কেড়ে নিয়েছ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কেড়ে নিয়েছ, জানো ?'

রোকেয়া বেগমের কথা শুনে সুমন দ্রুত বলে, 'কিন্তু কেন মা ! কেন ! কী অপরাধ করেছি আমি, বলেন !'

রোকেয়া বেগমের দু'টি চোখ জলে টলমল করে। অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করে তিনি বলেন,.'ছেলে বলো, আর মেয়ে বলো, উপমা আমার একমাত্র সন্তান। ক্যান্সারে ওর বাবা মারা যাবার পর ওকে আমি একসঙ্গে পিতার ভালবাসা আর মায়ের বুকভরা স্নেহ দিয়ে বড় করেছি। এই উপমাই আমার একমাত্র স্বপ্ন। একমাত্র সুখ। ভালবাসা। আমার এই-এইটুকু সুখ, এইটুকু ভালবাসা তুমি নষ্ট করে দিও না বাবা।'

রোকেয়া বেগমের কথা শুনে সুমন বলে, 'মা মেয়েকে ভালবাসবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ভালবাসবে না, তাও কি হয়, বলেন !'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে অনেকক্ষণ কান্না সংবরণ করে রেখেছিলেন। এবার বোধহয় আর পারেন না। অঝোর ধারায় কেঁদে রোকেয়া বেগম বলেন, 'শুধু ভালবাসবে, এটাই নয়। মা মেয়ের মঙ্গল চাইবে। ভাল চাইবে। অমঙ্গল দেখলে চিন্তিত হবে। কষ্ট পাবে। এটাও কি স্বাভাবিক নয়, বলো তুমি ?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আনমনে খানিক কী যেন ভাবে সুমন ! ভেবে বলে, 'আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন মা। আমি আসলে–'

আর বলতে পারে না সুমন। কথার মাঝখানে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে রোকেয়া বেগম বলেন, 'বললেই হল ! বললেই হল,

তুমি সুমন ! কী প্রমাণ আছে ! কী প্রমাণ আছে তোমার কাছে, বলো ! হঠাৎ করে একদিন কে না কে একজন বাড়িতে এসে বলল, আমি আপনাদের জামাই, ছোট্টবেলায় ছোট্ট উপমাব সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। ব্যস, হয়ে গেল ! কে না কে ছেলেটি উপমার স্বামী হয়ে গেল, না !'

রোকেয়া বেগম কথা শেষ করে অঝোর ধারায় বৃষ্টির মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

রোকেয়া বেগমকে এভাবে কাঁদতে দেখে সুমন এবার নিজের সঙ্গে আনা ব্যাগ খুলে, একটা ছোট্ট হিরের আংটি বের করে রোকেয়া বেগমকে দেখিয়ে বলে, 'দেখুন তো, বিয়েতে এই ছোট্ট হিরের আংটিটা আপনি আমার ছোট্ট আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন কি না ? মনে পড়ে কি না, দেখুন তো মা ?'

একমুহূর্ত দেরি করে না। রোকেয়া বেগম দ্রুত হিরের ছোট্ট আংটিটা নিজের হাতে নিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, এটাই তো। কিন্তু—'

এরপরও রোকেয়া বেগমের সংশয় পুরোপুরি দূর হয়নি দেখে সুমন বলে, 'আপনি প্রমাণ চেয়েছেন। আমি প্রমাণ দিলাম। আবার কিন্তু কেন, মা ?'

দুটো ভেজা চোখে তাকিয়ে অসহায়ের মতো রোকেয়া বেগম বলেন, 'আংটিটা তো ঠিকই আছে। তবু আমি কেন যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছুতেই না।'

রোকেয়া বেগমের এত কান্না সুমনের ভেতরটা ভিজিয়ে দেয় না তা নয়। সুমন তাই বলে, 'আপনি কাঁদবেন না মা। বিশ্বাস করুন, আমিই সেই সুমন। আমি মিথ্যে বলি না। আমি মিথ্যে বলিনি।'

তারপরও রোকেয়া বেগমের মন এক মায়ের মন। তাঁর অন্তর এক মায়ের অন্তর। মেয়ের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ভবিষ্যৎ এসব নিয়ে তিনি ভাববেন না, তা কী করে হয় ! সুমনের এত কথা, হিরের আংটি দেখানোর পরও তাঁর সন্দেহ, সংশয় কিছুই কিন্তু যায় না। তিনি সুমনের শোবার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার সময়ও বলেন, 'না। আমি বিশ্বাস করি না। কিছুতেই বিশ্বাস করি না তোমাকে। কিছুতেই না।'

রোকেয়া বেগম চলে গেলেও পুরো রাত আর সুমন কেন যেন ঘুমাতে পারে না। রাতভর বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে আর পুতুলের আদলে গড়া উপমাকে নিয়ে ভাবে।

বুঝতে পারে, ভালবেসে ফেলেছে। উপমাকে ভীষণ ভালবেসেছে সে।

রোজ বিকেলে সময় পেলেই নিরিবিলিতে ঘরে বসে গান গাওয়া সুমনের অনেক দিনের অভ্যাস। এ বাড়িতে এসে প্রথম-প্রথম দু'-চার দিন বিকেলে গান না গাইলেও, গত ক'দিন যাবৎ ঠিকই রোজ বিকেলে নিজের ঘরে বসে গীটার বাজিয়ে গান গায় সুমন। গানের গলা তার এমনিতেই খুব ভাল। গায়ও সে মন্দ না। ভালই।

অন্যদিনের মতো আজও বিকেলে ঘরে বসে আপন মনে গান গাইছিল। গান শুনে কখন এক পা-দু'পা করে নিঃশব্দ পায়ে উপমা এসে তার ঘরে ঢুকেছে, সে খেয়ালই নেই তার।

এমনিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, আধুনিক সবই গায়। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতই তার বেশি পছন্দের। আজ আপন মনে গাইছিল– 'ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে'।

গান শুনে তো একেবারে হতবাক হয়ে যায় উপমা। এত ভাল গায় ! এত সুন্দর গলা ! ভাবতেও পারেনি সে !

সুমন থামতেই উপমা হেসে বলে, 'বাপরে, এ তো দেখি একজন মহাগুণী শিল্পী আমাদের বাড়িতে উপস্থিত ! আমি তো ভাবতেই পারছি না, এত গুণ নিয়ে আপনি আমাদের এই অজপাড়াগাঁয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন !'

উপমা পরিহাস করছে ভেবে সুমন বলে, 'মস্করা করছেন, না !'

উপমা এক পা-দু'পা করে আরও কাছে এগিয়ে আসে। এসে বলে, 'না। মস্করা না। আপনার কণ্ঠের এবং আপনার গানের প্রশংসা করছি আমি।'

উপমার কথা শেষ হতেই কী ভেবে সুমন বলে, 'আপনার নাম উপমা, তাই না ?'

সুমনের একথার উত্তরে অন্যসব দিনের মতো বিদ্রুপ করে নয়, মিষ্টি

হেসে উপমা বলে, 'হ্যাঁ। আমার নাম উপমা। কিন্তু আমার নাম যে উপমা, আপনি কী করে জানলেন ?'

একমুহূর্তও দেরি করে না। সুমন বলে, 'এ্যদ্দিন ধরে এ বাড়িতে আছি। আপনার নাম জানব না ! নামটা কিন্তু বেশ !'

সুমনের কথা শেষ হতে না হতেই উপমা পাল্টা বলে, 'তাই নাকি !'

উপমার একথার পর সুমনের হঠাৎ কী হয় কে জানে ! এক পা-দু'পা করে সেও উপমার আরও কাছে গিয়ে বলে, 'একটা কথা বলব আপনাকে। কিছু মনে করবেন না তো ?'

সুমনের কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উপমা বলে, 'আরে, মনে করব কেন ? আপনি বলুন তো ? আমি অভয় দিচ্ছি। নির্ভয়ে বলুন ? নির্দ্বিধায় বলুন ?'

উপমার কথা শেষ হলেও যে বলে তা নয়। মাথা নিচু করে একমুহূর্ত কী যেন ভাবে সুমন ! ভেবে বলে, 'আপনি কি জানেন, আপনি কতটা সুন্দর ?'

সুমনের কথা উপমার বোঝার কথা নয়। সে বুঝতে পারেও না। সে তাই বলে, 'আপনার কথার মাথামুণ্ডু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বলছেন আপনি ! আমি কতটা সুন্দর, আমি জানি মানে !'

আবার আনমনে খানিক কী যেন ভাবে সুমন ! ভেবে বলে, 'আপনি জানেন না, আপনার উপমা আপনি শুধু নিজেই। উপমা নামটা তাই যিনি রেখেছেন, তাকে ধন্যবাদ। আমি আসলে সুন্দর দেখেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার মতো এত সুন্দর আগে কখনও দেখিনি।'

রূপের প্রশংসা বলে কথা, উপমার রক্তে তাই দ্রুত অপরিসীম খুশি ছড়িয়ে যায়। অপরিসীম খুশিতে সে তাই হেসে বলে, 'সুন্দর না ছাই ! হুতুম পেঁচা, বুঝেছেন ? হুতুম পেঁচা। আমার চেহারাটাও আমি আয়নায় কখনও দেখিনি ভেবেছেন ?'

উপমার কথা শেষ হতেই মিষ্টি হেসে সুমন বলে, 'না। আপনার কথা ঠিক নয়।'

ভেতরে-ভেতরে এত খুশি হলেও বাইরে কিন্তু দেখায় না। সুমনের কথার উত্তরে মুচকি হেসে উপমা বলে, 'ঠিক নয়, না ?'

একমুহূর্তও দেরি করে না সুমন। বলে, 'গোলাপ কি জানে, সে কতটা সুন্দর ? কতটা সুগন্ধ বিলায় সে ? জানে না।'

হতবাক হয়ে যায় উপমা। সুমনের একথার পর তাই কী বলবে না

বলবে আর কিছুই বুঝতে পারে না সে।

তাই বলে সুমন যে চুপ করে থাকে তা নয়। খানিক থেমে সে আবার বলে, 'আপনি বোধহয় নিজেও জানেন না, আপনি কতটা সুন্দর। কত স্নিগ্ধতা আপনার রূপে। আপনাকে সুন্দরী বললে সত্যি কম বলা হয়।'

কোথা থেকে যে এত লজ্জা এসে ভিড় করে চোখে-মুখে নিজেও বুঝতে পারে না উপমা। কিছু বলা তো দূরের কথা, চোখ তুলে আর কেন যেন তাকাতেও পারে না সে। মাথা নিচু করে তাই কেবল এদিক-ওদিক তাকায়, কিছুই বলে না।

সুমন কিন্তু থেমে থাকে না। সে একইরকম মুগ্ধ দু'চোখে তাকিয়ে আবার বলে, 'না। আপনাকে শুধু সুন্দরী বললে ভুল বলা হবে। আপনি সুন্দরীরও ওপরে। আপনি রূপসী।'

আর চুপ করে থাকা ঠিক নয় ভেবে উপমা বলে, 'থাক। আর মিথ্যে বলতে হবে না।'

নিজেও বুঝতে পারে রাজ্যের লজ্জা এসে ভিড় করেছে চোখে-মুখে। তাই আর দাঁড়িয়ে থাকে না। কথা বলতে-বলতে দ্রুত চলে যেতে থাকে উপমা।

উপমাকে হঠাৎ চলে যেতে দেখে সুমন বলে, 'শুনুন।'

সুমনের ডাক শুনে দরজার কাছে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় উপমা।

নিঃশব্দে এক পা-দু'পা করে উপমার কাছে গিয়ে সুমন বলে, 'সত্যের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। সাহস আছে, জানেন তো ? মিথ্যের কোনও সাহস নেই। সৌন্দর্যও নেই। আমি তাই মিথ্যে বলি না।'

প্রতিফোঁটা রক্তের মধ্যে অন্তহীন খুশির যেন বান ডাকে ! অপরিসীম খুশিতে চোখ-মুখ সব উজ্জ্বল করে হেসে উপমা বলে, 'বলেন। আপনি মিথ্যে বলেন। একটা বাংলা পাঁচের মতো মেয়েকে যদি রূপসী বলেন, মিথ্যে না তো কী, বলেন !'

কথা শেষ করে উপমা যে আর দাঁড়িয়ে থাকে তা নয়। চলে যায়।

তবে সুমনের ঘর থেকে বেরিয়ে খানিকটা সামনে যেতেই, বারান্দায় রাজা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। রাজা চৌধুরী নাতনীকে দেখেই হেসে বলেন, 'কী খবর হে সুন্দরী ? খবর-টবর সব ভাল তো ?'

উপমার ভেতরে তখনও গুঞ্জরিত হচ্ছে সুমনের বলা প্রতিটি কথা। প্রত্যেকটি শব্দ। সে তাই রাজা চৌধুরীকে দেখেই বলে, 'জানো দাদু, এক মজার কাণ্ড।'

রাজা চৌধুরী হেসে বলেন, 'না বললে জানব কী করে দাদু ?'

উপমা দ্রুত বলে, 'ঐ ছেলেটা, যে আমাদের বাড়িতে এসেছে, কী যেন নাম ?'

রাজা চৌধুরী হেসে বলেন, 'কী হয়েছে ? কী বলেছে ছেলেটা, দাদু ?'

উপমার যেন তর সয় না। সে বলে, 'কিছু হয়নি দাদু। তুমি দয়া করে ওর নাম বলো না ? কী যেন মিষ্টি একটা নাম, ভুলে গেলাম ছাই !'

নিঃশব্দে নয়, বেশ শব্দ করে হেসে রাজা চৌধুরী বলেন, 'শুধু নামটাই যে মিষ্টি তা তো নয়, মানুষটাও মিষ্টি তাও বলতে হবে দাদু। হ্যাঁ, ওর নাম সুমন। তা কী করেছে সুমন, বলো শুনি ?'

জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হেসে উপমা বলে, 'জানো দাদু, ছেলেটা না চমৎকার গান গায়। এমন সুন্দর গলা, এমন ভাল গায়, তোমাকে যে কী বলব, দাদু !'

উপমার সুমনকে একটু-একটু করে ভাল লাগুক, বৃদ্ধ মনে-মনে এটাই চেয়েছেন। তাই খুশির যেন সীমা থাকে না তাঁর। নাতনীর কথা শুনে তিনি তাই হেসে বলেন, 'বলতে হবে না। আর বলতে হবে না। এমনিতেই আমি বুড়ো হইনি। এমনিতে আমার মাথার চুল পাকেনি। আমি বুঝে গেছি। গান ভাল লেগেছে। তা গানের মানুষটাকেও ভাল লেগেছে কি না, বলো ?'

রাজা চৌধুরীর কথা পুরোপুরি শোনে না শোনে কে জানে ! একইরকম খিলখিল করে হেসে উপমা বলে, 'কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে, তোমাকে কী বলব দাদু ! আমাকে বলে কি না–'

'আমাকে বলে কি না' পর্যন্ত বলেই উপমাকে থেমে যেতে দেখে রাজা চৌধুরী বলেন, 'আমাকে বলে কি না পর্যন্ত বললে তো হবে না। কী বলে তাও বলতে হবে দাদু।'

মুখ ফসকে বেফাঁস কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেছে। দাদু মুরুব্বী। দাদুকে তো আর একথা বলা যায় না। উপমা তাই আমতা-আমতা বলে, 'আমাকে কী আবার বলবে ? কই, না তো। আমাকে আর কিছু বলেননি তো।'

উপমাকে কথা লুকাতে দেখে, রাজা চৌধুরীর খারাপ তো নয়ই, বরং বেশ ভাল লাগে। নাতজামাইকে নাতনীর একটু-একটু করে ভাল লাগতে শুরু করেছে। তাঁর ভাল না লেগে কি পারে !

এমনিতে গত ক'দিন ধরে মন খুব ভাল ছিল না তাঁর। তৈয়ব মিয়া নামের গ্রামের এক নব্য ধনী নতুন টাকাওয়ালা হওয়ার গরমে, হঠাৎ তাঁর

চরের বেশ কয়েক একর জমি কেনার জন্যে জোর-জবরদস্তী শুরু করেছেন। তিনি বিক্রি করবেন না বলেই দিয়েছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা ! নতুন ধনী তৈয়ব মিয়ারও কথা একটাই, তিনি কিনবেনই কিনবেন। মনটা তাই খারাপ হয়েছিল। নাতনীকে এত খুশি হতে দেখে মনটা তাই ভাল হয়ে যায়।

এ সময় কাজের লোক আলী এসে জানায়, তৈয়ব মিয়া তাঁর বন্দুকধারী দুই বডিগার্ড নিয়ে এসেছেন এবং বৈঠকখানা ঘরে বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বলে।

আর দেরি করেন না। সোজা বৈঠকখানা ঘরে এসে চেয়ার টেনে বসেই রাজা চৌধুরী বলেন, 'আমি বলছিলাম কী তৈয়ব মিয়া, বাঘ বৃদ্ধ হয়, এটা ঠিক। কিন্তু সে কখনও ঘাস খায়, এটা কি ঠিক, বলেন ? বংশানুক্রমে বছরের পর বছর ধরে চৌধুরী বাড়ির পূর্ব পুরুষেরা জমি কিনেছেন, বিক্রি করেননি। তাই–'

কথা শেষ করতে পারেন না রাজা চৌধুরী। কথার মাঝাখানে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তৈয়ব মিয়া বলেন, 'কিন্তু জমিটা তো আমার চাই।'

রাগে জ্বলতে থাকেন রাজা চৌধুরী। কিন্তু তিনি রাগ দেখান না। ভেতরের রাগ না দেখিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি এবার বলেন, 'কিন্তু আমি তো একবার না, বহুবার বলেছি। জমি আমি বিক্রি করব না।'

কথা বোধহয় শেষও হয় না রাজা চৌধুরীর, তৈয়ব মিয়া বলেন, 'দাম দেব। যত চান দেব, বুঝেছেন ? তবু কেন বিক্রি করবেন না ?'

ভেতরে-ভেতরে ভয়ানক রেগে গেলেও, দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে কোনওমতে সংযত রেখে রাজা চৌধুরী বলেন, 'কেন বিক্রি করব না, তাও বলতে হবে নাকি ! আমার ইচ্ছে, আমি বিক্রি করব না, ব্যস। কোনও কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজি নই।'

তৈয়ব মিয়া যে একথা শুনে থেমে থাকেন তা নয়। তিনি বলেন, 'ব্যাপারটা না বুঝলে তো হবে না রাজা সাহেব। ওখানে যে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি করব বলে সব ঠিকঠাক করেছি। জমিটার কথা বলে ব্যাংক থেকে লোন নেয়ার কথাও প্রায় পাকাপাকি হয়ে আছে। এখন যদি আপনি এসব বলেন, তাহলে যে সব গোলমাল হয়ে যাবে রাজা সাহেব।'

আর বোধহয় ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন না। রক্তজবার মতো দু'টো চোখে তাকিয়ে এবার বলেন তিনি, 'আমার জমি। আমি বিক্রি করব না। অথচ আপনি ইন্ডাস্ট্রি করার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছেন ! মারহাবা !

মারহাবা ! একে কী বলে জানেন ? যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই। শুনুন তৈয়ব মিয়া, একটা কথা বলি শুনুন। আপনি আমাকে দেখেছেন। কিন্তু আপনার সৌভাগ্য, আমার রাগ কখনও দেখেননি আপনি।'

নতুন টাকাওয়ালা হয়েছে। তাই টাকার সঙ্গে-সঙ্গে প্রভূত পরিমাণ অহংকারও হয়েছে। রাজা চৌধুরীর কথা তাই তৈয়ব মিয়ার ভাল লাগে না। ভেতরটা তাই বোধহয় জ্বলে ওঠে তাঁর। তিনি তাই পরিহাস করে বলেন, 'কই, না। শুনিনি তো। কখনও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বলে শুনিনি তো। পত্রিকায় আপনার রাগ করার নিউজটা ছাপা হলে নিশ্চয়ই পড়তাম। জানাও থাকত।'

তৈয়ব মিয়ার কথা শোনেন না শোনেন কে জানে ! রক্তের মতো দুটো লাল চোখে তাকিয়ে রাজা চৌধুরী বলেন, 'শোনেন ভাই সাহেব, আমার পূর্ব পুরুষেরা জমিদারী করেছেন মানে, বুঝতেই পারেন, যখন-তখন দু'চারটা খুন-খারাবিও করেছেন। প্রয়োজনে কী অপ্রয়োজনে চাবকে বেয়াদব প্রজার পিঠের চামড়াও তুলে দেননি তাও নয়।'

রাজা চৌধুরীর কথা বোধহয় শেষও হয় না, তৈয়ব মিয়া বলে, 'শোনেন রাজা সাহেব, শোনেন। এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার হাতিশালে হাতি ছিল। আপনার বাড়িতে রূপকথার এসব গল্প শুনতে আসিনি আমি। জানেন বোধহয়, আমার এখন ম্যালা টাকা। ম্যালা টাকা মানে, সময়েরও কিন্তু আমার ম্যালা দাম। আমি আমার মূল্যবান সময় অনেক অপচয় করেছি। আর সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কবে টাকা নেবেন ? কবে জমিটার দলিল করে দেবেন, বলেন ? আমি চলে যাই।'

মাথায় বোধহয় খুন চেপে যায়। শরীরের প্রতিফোঁটা জমিদারী রক্ত বোধহয় টগবগ করে ওঠে ! দাঁতে দাঁত চেপে রাজা চৌধুরী কোনওমতে বলেন, 'টাকার গরম দেখাচ্ছেন ! কিন্তু টাকা হলেই তো সব হয় না তৈয়ব মিয়া। যেমন ধরুন, আভিজাত্য হয় না। বংশ মর্যাদা হয় না। টাকা সব করতে পারে। কিন্তু সত্যকে কখনও মিথ্যে করতে পারে না। আমার নাম রাজা চৌধুরী। আমার নামের মতোই আমরা একদিন রাজা ছিলাম। কিন্তু আপনারা ?'

তৈয়ব মিয়ার ধৈর্যেরও বোধহয় বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি চোখ দুটো লাল করে বলেন, 'রাজা চৌধুরী সাহেব, আমিও কিন্তু মানুষ। আমারও কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে।'

রাগে, উত্তেজনায় রাজা চৌধুরী তখন কাঁপছেন ! রাগে গড়গড় করতে-

করতে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ। সীমা আছে। আপনার কথা আমি আপনাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমারও সহ্যের সত্যি একটা সীমা আছে। আর ঐ যে বললেন, আমিও মানুষ, তবে টাকা হলেও ছোট মানুষ। আমাদের মতো জমিদারী তো আর আপনাদের ছিল না। ছিলেন প্রজা। ছোট জাতের মানুষ এই যা।’

কথাটা বোধহয় তীরের মতো গিয়ে বিদ্ধ হয় তৈয়ব মিয়ার বুকের ভেতর। রাজা চৌধুরীর কথা শেষ হতে না হতেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য তৈয়ব মিয়া, দেহরক্ষীর হাত থেকে আচমকা বন্দুক কেড়ে নিয়ে রাজা চৌধুরীর বুক বরাবর তাক করেন। রাগে দাউদাউ আগুনের মতো জ্বলতে থাকা তৈয়ব মিয়া ট্রিগার টেপেন না তা নয়। তিনি বন্দুক তাক করে টিগার টেপেন ঠিকই। কিন্তু পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া সুমন এসে ধস্তাধস্তি করে, দ্রুত বন্দুক ওপরে তোলায় গুলি আর গায়ে লাগে না। তৈয়ব মিয়ার বন্দুকের গুলি রাজা চৌধুরীর গায়ে না লেগে ওপরে গিয়ে লাগে।

গুলির প্রচণ্ড শব্দে ছুটে আসে সবাই। ঘটনার আকস্মিকতায় বাড়ির সবাই যেন হতবাক হয়ে যায়।

বিমূঢ় রাজা চৌধুরী নিজের অজান্তেই সুমনকে বুকে টেনে নিয়ে কেঁদে বলেন, ‘তুমি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ। বলো বাবা, কী চাই তোমার, বলো ? যা চাইবে, কথা দিচ্ছি আমি আজ তোমাকে তাই দেব। বলো বাবা, কী চাই তোমার, বলো ?’

সুমন হেসে বলে, ‘ভালবাসা চাই দাদু। শুধু ভালবাসা চাই। আর কিচ্ছু না।’

রাজা চৌধুরী কথা বলে তখনও সুমনকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। জড়িয়ে ধরে রেখেই তিনি বলেন, ‘দেখলে তো বৌমা, দেখলে তো। কে আজ আমার জীবন বাঁচিয়েছে, তুমি দেখলে তো, বলো ?’

গুলির শব্দ শুনে অনেকের সঙ্গে উপমা, রোকেয়া বেগমও ছুটে এসেছেন। রাজা চৌধুরীর কথা শুনে শুধু উপমা নয়, রোকেয়া বেগমও কিছু বলেন না। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে কেউ কিছু বুঝতেও পারে না।

সুমন ঘরে ফিরতেই উপমাও কেন যেন এবার পেছন-পেছন তার ঘরে এসে ঢোকে।

উপমাকে দেখেই সুমন বলে, ‘আমাকে কিছু বলবেন, উপমা ?’

উপমার চোখে-মুখে তখন রাজ্যের খুশি ! অনেক খুশিতে উপমা হেসে

বলে, 'বলব বলেই তো এসেছি আমি।'

সুমন বলে, 'বেশ তো, কী বলবেন, বলেন ?'

মুচকি হেসে উপমা বলে, 'তাড়িয়ে দিচ্ছেন ?'

সুমন উপমার কথা শুনে দ্রুত বলে, 'ছি ! ছি ! কী বলছেন ! তাড়িয়ে দেব কেন ! আপনি এসেছেন, বরং আমি খুশিই হয়েছি।'

সুমনের একথা শুনে উপমার ভেতরটা যেন ভরে যায়। সে তাই হেসে বলে, 'সত্যি বলছেন তো !'

একমুহূর্ত দেরি করে না সুমন। সে বলে, 'হ্যাঁ। সত্যি বলছি।'

উপমা হেসে বলে, 'আমি এখন কেন এসেছি, বলেন তো ?'

সুমন বলে, 'আমি জানি না।'

উপমা জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হাসে। হেসে বলে, 'ধন্যবাদ দিতে এসেছি।'

উপমা কেন ধন্যবাদ দিতে এসেছে, সুমন যে বুঝতে পারে না তা নয়। তবু বলে, 'কেন ধন্যবাদ দিতে এসেছেন ?'

উপমা আবার একইরকম খিলখিল করে হেসে বলে, 'বারে, ধন্যবাদ দেব না আপনাকে ! এই পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয় কে যদি জিজ্ঞেস করেন, নির্দ্বিধায় বলব আমার দাদু। সেই দাদুকে আপনি আজ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ধন্যবাদ দেব না তো কী !'

সুমন মাথা নিচু করে একমুহূর্ত কী যেন ভাবে ! ভেবে বলে, 'আপনি খুশি হয়েছেন ?'

উপমা বলে, 'খুশি মানে ! কত খুশি হয়েছি, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না আমি।'

সুমন আবার কী ভাবে ! ভেবে বলে, 'আপনি খুশি হয়েছেন। ব্যস, এতেই আমি খুশি।'

উপমারও হঠাৎ কী হয় কে জানে ! সে বলে, 'আমি খুশি হলে আপনি খুশি হন ?'

সুমন একমুহূর্তও দেরি করে না। সে বলে, 'হ্যাঁ, হই। আপনি খুশি হলে আমি খুব খুশি হই।'

উপমা কেন যেন আর চোখ তুলে তাকাতে পারে না ! মাথা নিচু করে সে এবার বলে, 'তো একটা অনুরোধ করব আপনাকে ?'

সুমন বলে, 'বেশ তো, বলুন ?'

নিচু মাথা আরও নিচু করে উপমা বলে, 'আমাকে এখন থেকে আপনার

তুমি বলতে হবে। আপনার মুখ থেকে আমি এখন থেকে তুমি শুনলেই খুশি হব, বুঝেছেন ?'

এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি ! আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও সুমন এত খুশি হত কি না কে জানে ! অন্তহীন খুশিতে ঝলমল করে ওঠে তার চোখ-মুখ, সব। কোনওমতে সে এবার বলে, 'বেশ তো, এখন থেকে না হয় তুমিই বলব। কিন্তু আমারও যে একটা কথা আছে।'

উপমা স্বভাবতই বলে, 'কী কথা, বলেন ?'

সুমন বলে, 'এক হাতে কখনও তালি বাজে না, জানেন তো ?'

উপমা বলে, 'জানব না কেন ! খুব জানি।'

সুমন বলে, 'আপনাকেও কিন্তু আমাকে তুমি বলতে হবে উপমা।'

উপমারও খুশির যেন সীমা-পরিসীমা থাকে না ! জলতরঙ্গের মতো হেসে সে এবার বলে, 'আপনাকেও কিন্তু আমাকে, তুমি বলতে হবে নয়। তোমাকেও কিন্তু আমাকে তুমি বলতে হবে উপমা হবে। ঠিক কি না, বলেন ?'

কথা বলে যে উপমা আর দাঁড়ায় তা নয়। জলতরঙ্গের মতো খিলখিল করে হেসে চলে যায়।

ব্যস, হাজার খুশি যেন ছড়িয়ে যায় প্রতিফোঁটা রক্তের মধ্যে ! কেন এত ভাল লাগে, কেন এত খুশি লাগে, নিজেও বুঝতে পারে না সুমন !

রাত তখন কত হবে কে জানে !

শুধু বিশাল জমিদার বাড়ি নয়, সমগ্র রাখালিয়া গ্রাম তখন ঘুমে অচেতন।

কিন্তু চোখে ঘুম আসছিল না বলে সুমন ঘরে বসে, আপন মনে গীটারে টুং টাং শব্দ করে কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত, কখনও নজরুলগীতির সুরে এটা-ওটা বাজাচ্ছিল।

এ সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে গীটার বাজানো থামিয়ে, চমকে দরজার দিকে তাকায় সুমন। এত রাতে কে এল, বুঝতে পারে না সে।

দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দেখে, বাইরে উপমা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

এত রাতে উপমাকে দেখে হতবাক হয়ে যায় সুমন ! স্বভাবতই বলে, 'আপনি ! এত রাতে !'

উপমা মাথা নিচু করে ছিল। মাথা নিচু করেই বলে, 'আপনি নয়, তুমি হবে।'

উপমার কথা শুনে সুমন হেসে বলে, 'স্যরি, উপমা। হ্যাঁ, আপনি না। তুমি হবে। এসো, ভেতরে এসো উপমা।'

সুমনের একথার পরও যে ঘরে ঢোকে তা নয়। মাথা নিচু করে একমুহূর্ত কী ভেবে উপমা বলে, 'এত রাতে এসে আপনাকে বিব্রত করলাম, তাই না ?'

উপমার কথা শেষ হতেই সুমন বলে, 'কাজটা আসলে তুমি ঠিক করোনি উপমা। আর হ্যাঁ, তুমিও কিন্তু একই ভুল করলে।'

অবাক হয়ে উপমা বলে, 'ভুল !'

সুমন মিষ্টি হেসে বলে, 'হ্যাঁ, তুমিও ভুল করেছ উপমা। আমাকে

আপনি বলেছ তুমি। কি, তুমিও ভুল করোনি, বলো ?'

উপমাও হাসে। হেসে বলে, 'হ্যাঁ। ভুল করেছি। এবার থেকে শুধু তুমি বলব। তা এত রাতে কেন এসেছি, জানতে চাইলে না তুমি ?'

সুমন বলে, 'কেন উপমা ?'

উপমা খানিক আবার কী ভাবে ! ভেবে বলে, 'এত রাতে তোমার ঘরে ঢোকা বোধহয় ঠিক হবে না আমার। আকাশে কী চমৎকার চাঁদ উঠেছে ! বাইরে কী সুন্দর চাঁদের আলো ! কী চমৎকার জোছনা ! চলো না, দু'জনে পুকুর ঘাটে গিয়ে খানিকক্ষণ বসি।'

আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেও সুমন এত খুশি হত কি না কে জানে ! সে তাই দ্রুত বলে, 'বেশ তো, চলো।'

ঘাটে গিয়ে মুখোমুখি বসেই উপমা বলে, 'তুমি কে ? কেন এসেছ এখানে ?'

সুমন কেন যেন উপমার এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলে না। চুপচাপ থাকে।

উপমাই আবার বলে, 'তুমি আমার কে, কেন এসেছ দাদু আমাকে সব বলেছে।'

উপমার মুখে একথা শুনে সুমন চমকে মুখ তুলে তাকায়। কিন্তু কেন যেন এবারও কিছুই বলে না সে।

খানিক থেমে উপমা আবার বলে, 'এতদিন কেন তুমি আমাকে সব বলোনি, বলো ?'

সুমন মাথা নিচু করে একমুহূর্ত কী যেন ভাবে ! ভেবে বলে, 'আমি আসলে চেয়েছি তুমি আমাকে দেখো। বোঝ। ভালবাস। তারপর তোমাকে আমি সব বলব।'

চকিতে মুখ তুলে তাকায় উপমা। তাকিয়ে বলে, 'কি মনে হয় তোমার, আমি তোমাকে ভালবেসেছি ?'

একমুহূর্ত দেরি না করে সুমন বলে, 'ভালবেসে ধীরে-ধীরে তোমার ভালবাসা আমি আদায় করে নেব ভেবেছি। কিন্তু–'

'কিন্তু' পর্যন্ত বলেই আর বলতে পারে না সুমন। তাকে থামিয়ে দিয়ে উপমা বলে, 'ভালবেসেছি। বিশ্বাস করো, আমিও তোমাকে নিজের অজান্তেই একটু-একটু করে ভালবেসে ফেলেছি।'

খুশি ! সুমনের প্রতিফোঁটা রক্তের মধ্যে যেন হাজারো খুশি ছড়িয়ে যায়। অন্তহীন খুশিতে সে হেসে বলে, 'সারা জীবন এভাবেই ভালবাসবে

তো উপমা ?'

উপমার হঠাৎ কী হয় কে জানে ! অনেক খুশিতে শ্রাবণের ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলে সে। কেঁদে বলে, 'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন সুমন। সারা জীবন এভাবে ভালবাসবে তো, বলো ?'

সুমন কী ভেবে হাত বাড়ায়। উপমার একটা নরম হাত ছুঁয়ে সে বলে, 'আমার ভালবাসাকে আমি ভালবাসব না ? তুমি শুধু আমার ভালবাসাই নও উপমা। তুমি আমার জীবন। মরণ, সব।'

উপমা হাত ছাড়িয়ে নেয়। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে, 'আমি তাহলে যাই, কেমন ?'

প্রশ্ন করে যে উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করে উপমা তা নয়। সে উঠে দাঁড়ায়।

উপমাকে উঠতে দেখে সুমন বলে, 'চলে যাচ্ছ উপমা ? আর একটু থাক না।'

সুমনের কথা শুনে উপমা হেসে বলে, 'আরে ধ্যাৎ, একটু বলছ কেন ? আমি তো এরপর চিরকাল তোমার সঙ্গেই থাকব। খাব। ঘুমাব সাহেব, বুঝেছ ?'

কথা বলে আর অপেক্ষা করে না উপমা। চলে যায়।

উপমা চলে যাওয়ার পরই ভাবে সুমন, এ বাড়ির সবাই তাকে বিশ্বাস করলেও, ভালবাসলেও, একজন তাকে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি ! তিনি রোকেয়া বেগম। উপমার মা।

কী ভেবে সুমন উঠে দাঁড়ায়। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে অনেকদিন আগের সাদা-কালো মলিন একটা ছবি বের করে, রোকেয়া বেগমের শোবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এত রাতে রোকেয়া বেগমকে ঘুম থেকে জাগানো ঠিক হবে কি না খানিক ভাবে ! খানিক ভেবে দরজার কড়া নাড়ে সুমন।

দরজা খুলে রোকেয়া বেগম সুমনকে দেখেই বলেন, 'তুমি ! এত রাতে!'

দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে সুমন বলে, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

একমুহূর্ত কী যেন ভাবেন রোকেয়া বেগম। ভেবে বলে, 'এসো। ভেতরে এসো।'

রোকেয়া বেগমের পেছন-পেছন সুমন ভেতরে ঢোকে।

সুমন ভেতরে ঢুকতেই রোকেয়া বেগম বলেন, 'বলো, কী বলবে তুমি?'

একমুহূর্ত দেরি না করে সুমন বলে, 'এ বাড়িতে একমাত্র আপনিই আমাকে ভুল বুঝেছেন। তাই–'

মুখের কথা শেষ করতে পারে না সুমন। বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে রোকেয়া বেগম বলেন, 'হ্যাঁ। মিথ্যে বলব না। আমি এখনও তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি।'

রোকেয়া বেগমের কথা শেষ হতেই সুমন বলে, 'সেজন্যেই এত রাতে কিছু বলব বলে আপনার কাছে এসেছি। আপনি যদি অনুমতি দেন তো বলতে পারি।'

একটুও দেরি করেন না রোকেয়া বেগম। বলেন, 'ঠিক আছে। কী বলবে, বলো?'

সুমন নিজের ব্যাগ থেকে বের করে আনা অনেক দিনের পুরানো সাদা-কালো মলিন ছবিটা, রোকেয়া বেগমের হাতে দিয়ে বলে, 'দেখুন তো মা, এই ছবিটা চিনতে পারেন কি না।'

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও এত অবাক হতেন কি না কে জানে! ছবিটা হাতে নিয়ে যেন হতভম্ব হয়ে যান তিনি! সুমন আর উপমার বিয়ের ছবি। ছোট্ট উপমা বউ সেজেছে, আর সুমন সেজেছে বর। বিয়ের আসরে দু'জনে পাশাপাশি বসা। তিনি নিজেও আছেন অনেকের সাথে এ ছবিতে। রাজা চৌধুরীও যে নেই তা নয়।

রোকেয়া বেগমকে হতবাক হয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুমন হেসে বলে, 'এ ছবিতে ছোট্ট উপমা আর আমি যেমন আছি, তেমন আপনিও আছেন মা। আপনার পাশে আপনার মৃত স্বামী মানে উপমার বাবা ও দাদুও আছেন। আর কী প্রমাণ চাই আপনার, বলুন মা?'

ছবিটা একপলক দেখেই যেন কেঁপে ওঠেন তিনি! চোখের সামনের পৃথিবীটা যেন দুলে ওঠে তাঁর! অনেক দিন আগের হলেও এ দৃশ্য তিনি চিনবেন না তা তো নয়। দিশেহারার মতো তাকিয়ে রোকেয়া বেগম তাই বলেন, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ। এটা উপমারই বিয়ের ছবি। তাহলে তো–'

'তাহলে তো' পর্যন্ত বলেই রোকেয়া বেগম কেন যেন থেমে যান। আর বলতে পারেন না।

কথার মাঝখানে রোকেয়া বেগমকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে সুমন বলে, 'কী হল! থেমে গেলেন কেন মা! তাহলে কী, বলেন!'

উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রোকেয়া বেগম বলেন, 'তাহলে কি তুমিই

সুমন !'

সমস্ত মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে সুমন বলে, 'এখনও তাহলে কেন মা ! বিশ্বাস করুন–'

মুখের কথা মুখেই থাকে সুমনের। বলতে পারে না। মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রোকেয়া বেগম বল্লেন, 'হ্যাঁ। আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। তুমিই সুমন। তুমিই আমাদের সুমন।'

রোকেয়া বেগমের কথা শেষ হতে না হতেই সুমন রোকেয়া বেগমের পা ছুঁয়ে সালাম করে বলে, 'এমনি করে সেদিন আপনাকে, দাদুকে সালাম করে নৌকায় যাচ্ছিলাম। রাতে নদীতে ঝড় উঠল। ভীষণ ঝড়।'

সুমন থামে। সুমন থামতেই রোকেয়া বেগম বলেন, 'তারপর ? তারপর বাবা ?'

খানিক থেমে সুমন বলে, 'ঝড়ে নৌকা ডুবে মা-বাবা দু'জনেই মারা গেলেন। এক জেলে নৌকার মাঝি আমাকে উদ্ধার করে বাঁচায়। নিঃসন্তান সে জেলে দম্পতিই আমাকে মানুষ করে। আমি এবার ইকনমিক্সে মাস্টার্স করেছি মা।'

রোকেয়া বেগমের সংশয়, সন্দেহ আর কিছুই থাকে না। অপার আনন্দে সুমনকে কাছে টেনে নিয়ে তিনি এবার ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলেন।

সুমন রোকেয়া বেগমকে কাঁদতে দেখে বলে, 'আপনি কাঁদছেন কেন মা!'

মুষলধারে বৃষ্টির মতো কেঁদে রোকেয়া বেগম বলেন, 'এ কান্না দুঃখের নয় বাবা। আনন্দের। বড় আনন্দের, জানো ? এতদিন ভেবেছিলাম, ছোট্ট উপমার বোধহয় এভাবে বিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি। এখন মনে হচ্ছে–'

রাজা চৌধুরী বলেন, 'ঠিক হয়েছে, তাই না বৌমা ?'

কখন রাজা চৌধুরী দু'জনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দু'জনের কেউ জানে না। কথা শুনেই দু'জনের হুঁশ হয়।

রাজা চৌধুরীকে দেখে রোকেয়া বেগম বলেন, 'বাবা, আপনি !'

রোকেয়া বেগমের এ প্রশ্নের উত্তরে রাজা চৌধুরী হেসে বলেন, 'হ্যাঁ বৌমা, আমি। এত রাতে তোমার ঘরে আলো দেখে এগিয়ে এলাম। তোমাদের অনেক কথাই আমি দরজায় দাঁড়িয়ে শুনেছি। এবার বিশ্বাস হল তো, বৌমা ?'

একমুহূর্ত দেরি করেন না রোকেয়া বেগম। বলেন, 'হ্যাঁ, বাবা। ও সুমন। আমি স্বীকার করছি।'

রাজা চৌধুরীর যেন খুশির সীমা নেই, পরিসীমা নেই ! অন্তহীন খুশিতে

হো হো করে হেসে তিনি এবার বলেন, 'তো আমার আদরের নাতজামাই এ্যদ্দিন পর এসেছে, কথাটা দশ-বিশ গ্রামের মানুষকে উচ্চস্বরে জানান দিতে হয় বৌমা।'

রোকেয়া বেগম রাজা চৌধুরীর কথা শুনে অবাক হয়ে বলেন, 'জানান দিতে চান মানে ! কী করতে চান বাবা !'

হো হো করে হেসে রাজা চৌধুরী বলেন, 'কী বলছ বৌমা ! কী করতে চাই মানে ! অনেক দিন পর এ বাড়িতে একটু সুখ, একটু হলেও খুশি এল। তো আনন্দ করব না, বলো ! হ্যাঁ, আগামী শুক্রবার বাদ জুমা এ তল্লাটের গরিব-ধনী সবাইকে দাওয়াত করব আমি। খাওয়া-দাওয়ার এন্তেজাম হবে। সানাই বাজবে, বিসমিল্লাহ্ খাঁর সানাই। রং-বেরঙের আতশবাজি পোড়ানো হবে। বাদ্য-বাজনা হবে। আরও কত কী যে হবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই বৌমা !'

রাজা চৌধুরীর চোখে-মুখে এত আনন্দ অনেক দিন দেখেননি রোকেয়া বেগম। তিনি তাই হেসে বলেন, 'ওদের দু'জনের যে বিয়ে হয়েছে, এটা ঠিকই আছে। কিন্তু বাবা–'

'কিন্তু বাবা' পর্যন্ত বলেই রোকেয়া বেগম থেমে যান। কেন যেন আর বলতে পারেন না।

রোকেয়া বেগমকে থেমে যেতে দেখে রাজা চৌধুরী বলেন, 'কী হল ! আবার কিন্তু কেন, বৌমা !'

রোকেয়া বেগম সুমনের বুকে, পিঠে পরম মমতায় আলতো হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুমি না হয় এবার তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো বাবা। আমরা কথা বলি।'

রোকেয়া বেগমের কথা শেষ হতেই সুমন আর দাঁড়িয়ে থাকে না। চলে যায়।

সুমন চলে যেতেই রোকেয়া বেগম বলেন, 'বাবা।'

রাজা চৌধুরী বলেন, 'বলো মা ?'

রোকেয়া বেগম বলেন, 'ওদের দু'জনের ছোট্ট বেলায় বিয়ে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাসর হয়নি, বাবা।'

এমন একটা কথা শুনবেন বোধহয় ভাবতেও পারেননি বৃদ্ধ। রোকেয়া বেগমের কথা শুনে তাই অনেক খুশিতে হো হো করে হেসে বলেন, 'ও, এই কথা ! সাজাও বৌমা। তো তুমি আমার প্রিয় নাতনীর বাসর সাজাও। হ্যাঁ, প্রয়োজনে দূর-দূরান্তে লোক পাঠাও তুমি। নানা রঙের, নানা বর্ণের বাহারি

সব ফুল নিয়ে এসো। আমার হৃদয়ের টুকরো নাতনীর ফুলশয্যা। আর রঙ-বেরঙের জানা-অজানা সুগন্ধী সব ফুল থাকবে না ! এ হতেই পারে না বৌমা। এ হতেই পারে না।'

ব্যস, সাজ-সাজ রব পড়ে যায়।

রাজা চৌধুরী খুশি ! রোকেয়া বেগম খুশি! উপমা খুশি ! এত বড় এই বিশাল বাড়িতে যেন অন্তহীন খুশি ছড়িয়ে যায় !

এ বাড়ির এত সুখ কিন্তু অনেক দিন থাকে না।

নিজের সঙ্গে এ দু'-তিন দিন অনেক যুদ্ধ করে সুমন। শেষমেষ শুক্রবার দিন যখন বাড়িতে মহাধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে, বাড়িময় কত লোকজন, সুমন তখন উপমাকে নদীর ধারে নির্জনে কেন ডেকে আনে, উপমা বুঝতেও পারে না।

সুমনের চোখ-মুখ বিষণ্ন। বিষণ্ন দু'টি চোখে তাকিয়ে সুমন বলে, 'দুপুরে অনুষ্ঠান। সকাল বেলা আমি তোমাকে এখানে কেন ডেকে এনেছি, জানো তুমি ?'

উপমা কিছুই বুঝতে পারে না। সে বলে, 'না।'

সুমন মাথা নিচু করে বলে, 'আমাকে নিয়ে অনুষ্ঠান। কত লোক আসবে। কিন্তু কী অদ্ভুত দেখো, আমি কিন্তু সে অনুষ্ঠানে থাকব না।'

স্বভাবতই উপমা ভাবে, সুমনের একথা সত্যি নয়। হেঁয়ালি করছে সুমন। সে তাই বলে, 'আরে ধ্যাৎ, বাড়িতে অনুষ্ঠান। আর উনি আমাকে এখানে ডেকে এনে হেঁয়ালি করছেন ! হেঁয়ালি করারও সময় পাওনি তুমি, না !'

উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে সুমন বলে, 'হ্যাঁ, উপমা। বিশ্বাস করো তুমি। আমি থাকব না, চলে যাব।'

উপমা তখনও বুঝতে পারে না কী বলছে সুমন ! সে তাই বলে, 'চলে যাব বললেই হল ? কোথায় যাবে তুমি ? কোথায় যাবে তুমি আমাকে ফেলে ?'

মাথা নিচু করেছিল। চকিতে মুখ তুলে তাকায়। তাকিয়ে বলে সুমন, 'কিন্তু তোমাকে আমি সঙ্গে নেব কোন অধিকারে, উপমা ?'

সুমনের কথা উপমার বোঝার কথা হয়। বুঝতে পারেও না। সে তাই বলে, 'স্বামী-স্ত্রীর অধিকারে। আমি তোমার বউ নই, বলো ? হোক না অনেক ছোট্ট বেলার বিয়ে। তবু তো বিয়ে। বিয়ে করা বউকে ফেলে চলে যাবে, বললেই হল !'

উপমার একথা শুনে মাথা নিচু করে সুমন কোনওমতে বলে, 'আমি তোমাদের মিথ্যে বলেছি উপমা। এ্যদ্দিন ধরে যা বলেছি, সব মিথ্যে

বলেছি।'

উপমা কিন্তু তখনও বোঝে না, সুমন কী বলছে ! সে তাই বলে, 'তোমার মাথা ঠিক আছে তো ? চলো তো, বাড়ি চলো।'

এতক্ষণ যা হোক নিজেকে অনেক কষ্ট করে হলেও ধরে রেখেছিল। কিন্তু আর পারে না। একটা কান্নার ঢেউ যেন বুক ঠেলে, অন্তর ঠেলে বেরিয়ে আসে। অশান্ত বর্ষার ঝরঝর বৃষ্টির মতো কেঁদে সুমন বলে, 'বিশ্বাস করো উপমা, আমি তোমার সুমন নই।'

সুমনকে হঠাৎ কাঁদতে দেখে উপমা যে ঘাবড়ে যায় না তা নয়। হতচকিত উপমা ঘটনার আকস্মিকতায় দ্রুত বলে, 'তুমি এসব কী বলছ, বলো তো !'

সুমন কেঁদে বলে, 'তোমার এক মামা আছে। নাম সবুর উদ্দিন, তাই না ?'

উপমা বলে, 'হ্যাঁ। সবুর মামা।'

সুমন বলে, 'তোমাদের কিছু জমির দলিল জাল করেছিলেন বলে, তোমার মা আর দাদু ওনাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।'

উপমা বলে, 'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কী হয়েছে !'

সুমন মাথা নিচু করে একমুহূর্ত কি যেন ভাবে ! তারপর দু'চোখের জল মুছে বলে, 'অর্থনীতিতে ভাল রেজাল্ট করে মাস্টার্স করেও, আমি অফিসের দরজায়-দরজায় ঘুরে একটা চাকরি পাইনি। দু'বছর ঘুরেও যখন চাকরি হল না, তখন বুঝলাম আর হবে না। এত সার্টিফিকেট সব মূল্যহীন। টাকাই মূল্যবান। ভদ্রভাবে বাঁচার আশা যখন শেষ, তখন গরিব কেরানি বাবার ছেলে এই সুমন, কখন অন্যায় কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি বলতেও পারব না। হ্যাঁ উপমা, আমি ছিনতাই করেছি। ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে গুলি খেয়েছি। তখনই একদিন তোমার মামার সঙ্গে দেখা।'

সুমন থামে। সুমন থামতেই উপমা বলে, 'তারপর ?'

সুমন বলে, 'তোমার মামা বললেন, তোমাকে আমি এক সুন্দরী রাজকন্যা ও রাজত্বের ঠিকানা দিতে পারি। তবে শর্ত হচ্ছে, রাজকন্যা তোমার। রাজত্বের অর্ধেক তোমার। অর্ধেক আমার। বিয়ের ছবিটা ও আংটিটা উনিই আমাকে দিয়েছেন। ছবিটা ওনার কাছে ছিল। আংটিটা তোমার মা ওনাকে দিয়েই বানিয়েছিলেন। ডিজাইনটা মনে ছিল ওনার। ডিজাইন মতো আংটিটা ঢাকা থেকে মামা আমি আসার আগে, অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আমাকে দিয়েছেন। তবে এবারেরটা হিরে নয়। কাঁচ। ঠিক আমার

মতো। আমি যেমন আসল নই, নকল।'

সুমন আবার থামে। সুমন থামতেই উপমা বলে, 'তারপর ?'

ক্রন্দনরত সুমন চোখের জল মুছে বলে, 'এলাম। রাজকন্যা ও রাজত্ব পেয়েও গেলাম। কিন্তু একদিন উপলব্ধি করলাম–'

সুমন আবার থামে। সুমন থামতেই উপমা বলে, 'কী উপলব্ধি করলে, বলো ?'

জলেভেজা দু'চোখে তাকিয়ে সুমন বলে, 'উপলব্ধি করলাম, সুন্দরী সেই রাজকন্যাকে নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলেছি আমি।'

সুমনের এত কান্না দেখে উপমা নিজেও কখন কেঁদে ফেলেছে, বলতেও পারবে না। বৃষ্টির মতো কেঁদে উপমা বলে, 'না। বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না আমি। ভালই যদি বাসবে তো চলে যাচ্ছ কেন তুমি !'

সুমন কেঁদে বলে, 'মানুষ চাঁদকে ভালবাসে উপমা। কিন্তু তাই বলে বামন হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়ালেই কী হবে ! চলে যাচ্ছি কেন জানতে চেয়েছ। তোমাকে বড় ভালবাসি বলেই চলে যাচ্ছি উপমা। নিজের ভালবাসার সঙ্গে নিজে কি ছলনা করতে পারি, বলো তুমি !'

সুমন নদীর ধারে একটা বড় গাছের নীচে নিজের গীটার ও ব্যাগটা আগেই এনে রেখেছে।

ব্যাগ ও গীটার কাঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দু'পা এগিয়েও, আবার কেন যেন থমকে দাঁড়ায় সুমন। দাঁড়িয়ে কোনওমতে বলে, 'তুমি ভুলে যেতে পারবে কি না জানি না। তবে আমি এত সুখ, এত ভালবাসা কখনও ভুলতে পারব না।'

পেছন ফিরে আর না তাকিয়ে অনেক কষ্টে চলে এলেও, আসার সময় সুমন দেখে উপমা শোকে, দুঃখে, অনেক অভিমানে মাটিতে বসেই অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ভালবাসা এত যন্ত্রণার, কষ্টের জানা ছিল না ! সুমনেরও মনে হয় বুকটা বোধহয় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল তার !

স্টেশনে এসে দেখে, ট্রেন লেইট।

ভাবে, আচ্ছা ট্রেন এলেই ঝাঁপ দিয়ে মরে গেলে কেমন হয় ! স্বভাবতই ভাবে, কেন বাঁচবে ! কিসের জন্যে আর ভালবাসাহীন এ জীবন নিয়ে অহেতুক বেঁচে থাকবে !

স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে বসে জীবন-মৃত্যু নিয়ে কত কী ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই, পাশে বসা সত্তর বছরের বৃদ্ধ আবদুর রহমান

অনেকক্ষণ যাবত তাকে দেখে বলেন, 'তোমার কী হয়েছে ভাই ?'

বৃদ্ধ যদিও যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলেন, সুমনের তবু ভাল লাগে না। সে তাই বলে, 'কেন বলুন তো !'

বৃদ্ধ আবদুর রহমান হেসে বলেন, 'তোমাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। কী হয়েছে তোমার ?'

এত সুন্দর করে, এত নরম করে বৃদ্ধ বলেন যে, সুমনের এবার আর অতটা খারাপ লাগে না। সে তাই বলে, 'আপনি কে ?'

বৃদ্ধ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে তাঁর একটা কার্ড সুমনের হাতে দিয়ে বলেন, 'আমার নাম আবদুর রহমান। দেশের মানুষ আমাকে 'রহমান গ্রুপের' চেয়ারম্যান বলে জানে। সারাদেশে আমার অনেক শিল্প কারখানা।'

বৃদ্ধের কথা শেষ হলেও সুমন কেন যেন এবার কিছু বলে না। কেবল কান পেতে থাকে বৃদ্ধ এরপর কী বলে তা শোনার জন্যে।

বৃদ্ধ আবদুর রহমান কিন্তু চুপ করে থাকেন না। তিনি এবার বলেন, 'আমার অনেক আছে। কিন্তু সুখ নেই। কিন্তু তোমার কিছু নেই। সুখও নেই। আমি বেশি দুঃখী, না তুমি বেশি দুঃখী বুঝতে পারছি না। তাই তোমার দুঃখের গল্পটা আমি শুনতে চাঁই। বলবে না ?'

লোকটার কথা শুনে অবাক না হয়ে পারে না সুমন। সে তাই বলে, 'আমার যে কিছুই নেই, কী করে বুঝলেন আপনি !'

আবদুর রহমান নামের স্যুট-টাই পরা বৃদ্ধ হেসে বলেন, 'মানুষ চরিয়ে খাই বাবা। আর তোমার বার-বার দীর্ঘশ্বাস ফেলা, বিধ্বস্ত চেহারা-ছবি দেখে এটুকু বুঝব না !'

সুমনের কী হয় কে জানে ! লোকটাকে দেখে, কথা শুনে ভাল লাগতে শুরু করে তার। সে তাই বলে, 'আমার দুঃখের কথা শুনে আপনার কী লাভ ?'

আবদুর রহমান নিঃশব্দে হাসেন। হেসে বলেন, 'লাভ না হলেও, ক্ষতি তো নেই। তুমি বলো ? আমি শুনব। তাছাড়া এ তো আর ব্যবসা-বাণিজ্য নয় যে, লাভ-লোকসানের হিসেব করতে হবে।'

বৃদ্ধের কথা শুনে হঠাৎ মনে হয় সুমনের, লোকটাকে সব খুলে বললে হয়তো খানিকটা হালকা লাগতে পারে। তাই আর দেরি করে না। একে-একে সব খুলে বলে সে।

সব শুনে বৃদ্ধ আবদুর রহমান বলেন, 'তুমি যদিও জীবনে ভাগ্যের কোনও দরজা খোলা না পেয়ে ছিনতাই করেছ, ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে গুলি পর্যন্ত খেয়েছ, তবু আমি কিন্তু তোমার নিন্দা নয়, প্রশংসাই করব।'

বৃদ্ধের কথা শুনে যেন হতবাক হয়ে যায় সুমন। ভাবে, লোকটার মাথা খারাপ নয় তো ! নইলে ছিনতাই, ব্যাংক ডাকাতির কথা শুনেও প্রশংসা করছে লোকটা !

খানিক থেমে বৃদ্ধ আবার বলেন, 'আমি জানি, আমার কথা শুনে তুমি অবাক হয়েছ। ভাবছ, এত কিছু শুনেও লোকটা আমার প্রশংসা করছেন কেন ! লোকটার মাথা খারাপ নয় তো ! না, আমার মাথা খারাপ নয় সুমন। উপমার মতো সুন্দরী মেয়ে, এত বিষয়-সম্পত্তি পেয়েও যে ছেড়ে আসে, সে ভাল না তো কী ! তা তোমার গল্প তো এতক্ষণ শুনলাম। এবার আমার গল্প শুনবে না তুমি, বলো ?'

সুমন দ্রুত বলে, 'হ্যাঁ, শুনব। কেন শুনব না ? আপনি বলেন। আমি শুনছি।'

বৃদ্ধ আবদুর রহমান বলেন, 'আমার জীবনে কিন্তু তোমার মতো গরিবি ছিল না। অভাব-অনটন কিচ্ছু ছিল না। বলতে পারো, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি আমি। ব্যবসায়ী বাবার অনেক ছিল। আমি বাড়িয়ে আরও অনেক করেছি। ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। স্ত্রী মৌমিতা একমাত্র সন্তান সূচনাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। ঐ এক সন্তানের দিকে তাকিয়ে আর বিয়ের কথা ভাবিনি। মায়ের ভালবাসা, বাবার স্নেহ দিয়ে ওকে আমি বড় করেছি। বিয়েও দিয়েছি দেখে-শুনে।'

একটানা কথা বলে বৃদ্ধ আবদুর রহমান থামেন।

বৃদ্ধ আবদুর রহমানকে থামতে দেখেই সুমন বলে, 'তারপর ? তারপর কী, বলেন ?'

খানিক থেমে বৃদ্ধ আবার বলেন, 'যার কাছে সূচনাকে তুলে দিয়েছিলাম, তার নাম মিজান। গরিবের মেধাবী ছেলে মিজানকে আমি শুধু দেশে নয়, আমেরিকা থেকে এমবিএও করিয়ে এনেছি। সূচনার একটা পুত্র সন্তানও হল। তখন আমার এত সুখ, তোমাকে আর কী বলব ? আমার এত ঘরভরা সুখ দেখে বিধাতা বোধহয় ওপরে বসে হাসছিলেন। একদিন ঢাকার রাস্তায় কার এক্সিডেন্টে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায় সূচনা। এরপর ব্যবসার কোটি-কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে মিজান সরে পড়ে। ডিভোর্স দেয় সূচনাকে। এখন শুধু বিছানায় পড়ে আছে মেয়েটা। নড়াচড়া করে না। দেখলেই আমার বুকটা ভেঙে যায়। চোখ ফেটে পানি আসে, জানো ?'

বৃদ্ধ আবদুর রহমান থামেন। সুমন দেখে বৃদ্ধ আবদুর রহমানের পুরু লেন্সের চশমার ওপাশে চোখ দুটো জলে টলমল করছে।

বৃদ্ধ আবদুর রহমান খানিক থেমে আবার বলেন, 'ওকে রেখে আমি মরতেও পারছি না বাবা। এখন বলো, কে বেশি দুঃখী ? তুমি, না আমি ? কে ?'

প্রশ্নটা কঠিন নয়। তাই উত্তর দিতে দেরি হয় না সুমনের। সে বলে, 'দুঃখী আসলে আমরা দু'জনেই। তবে আমার মনে হয়, আমি বেশি দুঃখী নই। আপনিই বেশি দুঃখী। কারণ, আমার নেই, তাই আমি তো দুঃখী হবই। কিন্তু আপনার অনেক আছে। তবু আপনি দুঃখী। কী অদ্ভুত, তাই না !'

সুমনের কথা শেষ হতেই বৃদ্ধের কী হয় কে জানে ! তিনি বলেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব বাবা ?'

একমুহূর্ত দেরি করে না সুমন। বলে, 'অনুমতির দরকার নেই। কী বলবেন, বলেন আপনি ?'

মাথা নিচু করে একমুহূর্ত ভেবে বৃদ্ধ বলেন, 'আমার অসহায় পঙ্গু মেয়েটাকে তুমি ভালবাসবে বাবা ? ভালবেসে ওকে তুমি তোমার জীবনে গ্রহণ করবে ?'

ঘটনার আকস্মিকতায় যেন হতভম্ব হয়ে যায় সুমন ! এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে, কী বলবে না বলবে আর কিছুই বুঝতে পারে না সে ! তাই কোনও কিছুই না বলে বৃদ্ধের মুখের দিকে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে থাকে সুমন !

সুমনকে চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, বৃদ্ধ পকেট থেকে রুমাল বের করে দু'চোখ মুছে বলেন, 'পাষাণ প্রতিমার মতো বিছানায় পড়ে আছে। কে ওকে ভালবাসবে ! আমি জানি, কেউ ওকে ভালবাসবে না।'

বৃদ্ধ আবদুর রহমানের চোখের জল এবং তাঁর কথা শুনে কী হয় কে জানে ! সুমন বলে, 'আমি ভালবাসব।'

কথা বোধহয় শেষও হয় না সুমনের, ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধ। জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমার টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্য সব আমি তোমাকে দিলাম বাবা।'

বৃদ্ধ আবদুর রহমানকে কথা দিয়েছেন, সূচনাকে ভালবাসবেন।

বৃদ্ধ আবদুর রহমান এখন আর নেই। অনেক আগেই মারা গেছেন। কিন্তু সুমন রহমান আজও জানেন না, বিছানায় শায়িত পঙ্গু স্ত্রী সূচনাকে কতটা কী ভালবাসতে পেরেছেন। তবে এটা ঠিক, তিনি ভালবাসতে চাননি তা নয়। চেয়েছেন !

পরপর ক'রাত ঘুমাতে পারেননি সুমন রহমান। রাতভর কত কী যে ভাবেন তার কোনও ইয়ত্তা নেই !

সুমনা, সূচনা, সবুজ কেউ নয়, কেন যেন আজ বারে-বারে উপমার কথাই মনে পড়ে তাঁর।

সূচনা বিছানায় শুয়ে স্বামীকে দেখেন। বুঝতে বাকি থাকে না তাঁর, গত ক'রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেই কাটিয়েছেন সুমন রহমান। ঘুমাতে পারেননি। তিনি তাই স্বামীকে ডেকে পাশে বসিয়ে বলেন, 'গত ক'রাত একটুও ঘুমাতে পারনি তুমি, না ?'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিথ্যে, ছলনা এসব নেই বললেই চলে। তিনি তাই কিছু না বললেও, মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

স্বামীকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে দেখে সূচনা আস্তে-আস্তে বলেন, 'কী হয়েছে তোমার ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে কেন যেন কিছু বলেন না সুমন রহমান। স্ত্রীর শিয়রের পাশে চুপচাপ বসে থেকে কেবল কী ভাবেন !

সুমন রহমান কিছু বলছেন না দেখে সূচনা ধীরে-ধীরে বলেন, 'আমি বলব তোমার কী হয়েছে ? শুনবে তুমি ?'

সূচনার এ কথা শুনে সুমন রহমান এবার বলেন, 'বলো ?'

তখনই যে বলেন তা নয়। একমুহূর্ত চুপচাপ থেকে বিছানায় শায়িত পঙ্গু সূচনা বলেন, 'যাঁকে ভালবেসেও জীবনে পাওনি, তাঁর কথাই ভাবছ তুমি। কি, ঠিক বলিনি আমি, বলো ?'

জেনে-শুনে স্ত্রীকে কখনও মিথ্যে বলেননি। কিছু লুকানওনি। সুমন রহমান তাই বলেন, 'হ্যাঁ, সূচনা।'

সুমন রহমান কথা শেষ হতেই সূচনা বলে, 'তুমি কিন্তু ভাল করে

অফিসও করছ না আজকাল। যাও। আজ হসপিটাল থেকে না হয় খানিক ঘুরে এসো। হসপিটালে খানিক ঘুরে এলে হয়তো ভাল লাগবে তোমার।'

সূচনার পরামর্শ খারাপ লাগে না। ভাবে, হসপিটাল থেকে খানিক ঘুরে এলে ভাল লাগতেও পারে।

স্ত্রীর কথা কখনও ফেলেননি। আজও ফেলেন না। ব্যস, সোজা হসপিটালে চলে আসেন।

গত ক'দিন দেখা নেই সুমন রহমানের। চেম্বারে ঢুকতেই সুমনা তাই পড়ি কি মরি করে সামনে এসে দাঁড়ায়।

সুমনাকে দেখেই সুমন রহমান বলেন, 'বসো, সুমনা।'

সুমন রহমানের কথা শুনে সুমনা যে বসে তা নয়। সে অভিমান করে বলে, 'গত ক'দিন কোথায় ছিলেন ! দেখা নেই কেন আপনার !'

সুমনার কথার উত্তরে সুমন রহমান হেসে বলেন, 'বসো, সুমনা। আগে বসো।'

সুমন রহমানের এ কথার পর সুমনা মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলে, 'কী হয়েছে আপনার, বলুন তো ? চোখ-মুখ সব কেমন যেন বিষণ্ন ! চোখের নীচে এ ক'দিনেই একদম কালি পড়ে গেছে !'

সুমনার একথা শুনে সুমন রহমান হেসে বলেন, 'কই, না তো। কী আবার হবে ! কিচ্ছু হয়নি আমার।'

কী ভেবে সুমনা আর এ বিষয়ে কথা বলে না। সে এবার বলে, 'চাকরি হয়েছে ক'মাস হল। বাড়ি যাইনি। আমার ছুটির দরকার। ছুটি দেবেন আমাকে ?'

কথা বোধহয় শেষও হয় না সুমনার, সুমন রহমান বলেন, 'বেশ তো, কবে ছুটি চাও, বলো ?'

সুমনা বলে, 'আমি জানি, শুধু ছুটি না, আপনার কাছে আমি আপনার হৃৎপিণ্ডটা চাইলেও আপনি বোধহয় দিয়ে দেবেন। আচ্ছা, আপনি আমাকে এত ভালবাসেন কেন, বলেন তো ?'

এ প্রশ্নের উত্তরে সুমন রহমান কেন যেন কিছু বলেন না। কেবল হাসেন।

সুমন রহমান চুপ করে থাকলেও সুমনা যে চুপ করে থাকে তা নয়। সে বলে, 'অথচ আমারও একজন বাবা আছেন। জন্মদাতা বাবা। আপনিও মানুষ। তিনিও নাকি মানুষ !'

সুমনার এ কথা শুনে সুমন রহমান বলেন, 'বাবাকে শ্রদ্ধা করতে হয়

মা। বাবাকে এভাবে বলতে হয় না।'

সুমন রহমানের একথা শুনে কী হয় কে জানে ! উত্তেজনায়, আবেগে চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল হয়ে উঠতে সময় লাগে না তার ! ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে সংযত করে কোনওমতে সুমনা কেবল বলে, 'বাবা, না !'

সুমনাকে এত রেগে যেতে দেখেও সুমন রহমান বলেন, 'শোনো মা, ভাল হোক, মন্দ হোক, বাবা বাবাই। তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হয়।'

উত্তেজিত সুমনা দ্রুত বলে, 'শ্রদ্ধা করতে হয় মানুষকে। অমানুষকে তো নয়। হিংস্র কোনও পশুকেও নয়। আপনি জানেন না, আমার মা কত দুঃখী ! আমার মা'র জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে, নষ্ট করে দিয়েছে এই বাবা নামের লোকটা। মানুষ ভণ্ড হয়, মিথ্যুক হয়, প্রতারক হয়। কিন্তু এত ভণ্ড, এত মিথ্যুক, এত প্রতারক হয়, আমি আমার ঐ জন্মদাতা বাবা নামের লোকটাকে কাছে থেকে না দেখলে কোনও দিন বুঝতেও পারতাম না। জানতামও না।'

একটানা কথা বলে সুমনা থামে।

সুমনা থামলেও সুমন রহমান কেন যেন কিছু বলেন না।

সুমনাই আবার বলে, 'ঐ হিংস্র লোকটা রাত-দিন আমার মাকে মারত, জানেন ? মার খেতে-খেতে কোনও-কোনও দিন অজ্ঞানও হয়ে যেত আমার মা।'

এবার বোধহয় আর চুপ করে থাকতে পারেন না সুমন রহমান। তাই বলেন, 'কেন, মারত কেন ?'

একমুহূর্ত দেরি করে না। সুমনা বলে, 'নিজে চরিত্রহীন, লম্পট, মদখোর, জুয়াড়ী ছিল। অথচ মাকে কি না বলে—'

'মাকে কি না বলে' পর্যন্ত বলে আর বলতে পারে না সুমনা। মুষলধারে বৃষ্টির মতো কেঁদে ফেলে সে।

সুমনাকে এভাবে কাঁদতে দেখে কেন যেন এবার আর কিছু বলেন না সুমন রহমান। চুপচাপ ক্রন্দনরত সুমনার দিকে তাকিয়ে কেবল বসে থাকেন তিনি।

খানিক কেঁদে-কেটে সুমনাই আবার বলে, 'ছোট্টবেলায় পুতুল খেলার মতো বিয়ে হয়েছিল বাবা আর মা'র। বিয়ের পর কোথায় যেন হারিয়ে যান তিনি। প্রায় সাতাশ বছর পর আবার ফিরে আসেন। তবে ফিরে না এলেই বোধহয় ভাল হত।'

সুমন রহমান দ্রুত বলেন, 'একথা কেন বলছ সুমনা ! তিনি তোমার বাবা।'

রাগে, দুঃখে, অভিমানে দাঁতে দাঁত চেপে ক্রন্দনরত সুমনা বলে, 'হ্যাঁ, বাবা। জন্ম দিলেই যদি বাবা হন, তাহলে বাবাই তো। ছোট্টবেলার পুতুল খেলার মতো শুধু এ বিয়ে নয়, এ জীবনে আরও বিয়ে করেছেন। আমাদের গ্রামেই একটা। পাশের গ্রামে আরও দুটো। আরও কত মহিলার সঙ্গে যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই ! জানেন, রাতভর মদ খেত। জুয়াও খেলত।'

সুমনা থামে। সুমনা থামতেই সুমন রহমান বলেন, 'তারপর ? তারপর সুমনা ?'

সুমনা দু'টি জলে ভেজা চোখে তাকিয়ে বলে, 'ঘরজামাই হয়ে মা'র কাঁধের ওপর চেপে বসে একটার পর একটা জমি বিক্রি করেন, আর রাত-দিন এসব করেন। মা বাঁধা দিলেই মারেন। বলে কি না, বাবার মিথ্যে পরিচয়ে একটা ছেলে নাকি বাবা ফেরার বছর দেড়েক আগে আমাদের বাড়িতে এসে থেকেছে। তার সঙ্গে নাকি মা'র প্রেম ছিল !'

ব্যস, চমকে ওঠেন সুমন রহমান। চোখের সামনের পৃথিবীটাই যেন দুলে ওঠে তাঁর। সুমনা থামতেই তিনি বলেন, 'তারপর ! তারপর কী, বলো মা !'

দু'চোখের জল মুছে সুমনা বলে, 'আমি মানুষ দেখেছি। পশুও দেখেছি। কিন্তু পশুর মতো এমন মানুষ আর দেখিনি, জানেন ?'

একমুহূর্ত ভেবে সুমন রহমান বলেন, 'তোমার বাবা এখন কোথায় সুমনা ?'

সুমনা বলে, 'জানি না।'

সুমন রহমান স্বভাবতই অবাক হয়ে বলেন, 'জানো না মানে !'

সুমনা দু'টি জলে ডোবা চোখ তুলে বলে, 'না। সত্যি জানি না। আমার দুঃখী মাকে কখনও একটুও ভালবাসেনি, জানেন ? টাকা ফুরিয়ে গেলেই আসে। জমি-জমা কিছু বিক্রি করে ফুর্তি করার জন্যে আবার চলে যায়।'

ঠিক এসময় ডান পকেটে রাখা মোবাইল ফোন বেজে ওঠে সুমন রহমানের। সুইচ টিপে ফোন অন করতেই সবুজ বলে, 'বাবা, বাড়িতে মেহমান এসেছেন। মা তোমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে বললেন।'

সুমন রহমান 'আসছি বাবা' বলেই ফোন অফ করে, সুমনার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কেঁদে তো মন খারাপ করে ফেলেছ মা। বাড়িতে কে যেন

একজন মেহমান এসেছেন। নিশ্চয়ই খানাপিনার এন্তেজাম হয়েছে। আমার সঙ্গে এখন বাড়ি যাবে সুমনা ? চলো না, যাই।'

আর কিছু না হোক, সবুজের সঙ্গে তো দেখা হবে। সুমনা তাই আপত্তি করে না। সে বলে, 'চলুন। যাই।'

গাড়িতে বসে দু'জনের কেউ আর কেন যেন কিছু বলে না।

বাড়ি পৌঁছে সুমন রহমান নামার আগেই সুমনা গাড়ি থেকে নেমে, তাড়াহুড়ো করে বিছানায় শায়িত সূচনার ঘরে গিয়ে ঢোকে। আর ঢুকে তো ভূত দেখার মতো যার-পর-নাই চমকে ওঠে সে !

সূচনার সামনে সবুজের পাশে কে বসে আছেন বিছানায় ! কে !

এ পৃথিবীতে সবচে' প্রিয় মানুষটিকে চিনতে তার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সে তাই হতবাক হয়ে দ্রুত বলে, 'মা, তুমি !'

উপমা সূচনাকে দেখিয়ে বলেন, 'উনি একটা লোক পাঠিয়ে আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন, মা।'

উপমা সুমনার পেছনে দাঁড়ানো সুমন রহমানকে না দেখলেও, সুমন রহমান উপমাকে এতদিন পর হঠাৎ এখানে দেখে হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে থাকেন।

সূচনা ধীরে-ধীরে বলেন, 'আমি আপনার কাছে একটা ভিক্ষে চাই বোন।'

উপমা স্বভাবতই অবাক হয়ে বলেন, 'কী বলছেন আপনি ! ভিক্ষে !'

সূচনা বলেন, 'একটা ভিক্ষে চাইব বলেই, এতদূর থেকে আপনাকে ডেকে এনেছি, জানেন ?'

সূচনার কথা উপমার বোঝার কথা নয়। বুঝতে পারেনও না তিনি। তাই বলেন, 'আমার কি ভিক্ষে দেয়ার কোনও ক্ষমতা আছে ! আপনারা কত ধনী ! আর আমার কাছেই কি না ভিক্ষে চাইছেন ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না !'

একটুও দেরি করেন না। সূচনা ধীরে-ধীরে বলেন, 'হ্যাঁ। ভিক্ষে চাই। আপনার ডাক্তার মেয়েটাকে আমার ঐ বোকা ডাক্তার ছেলেটার জন্যে ভিক্ষে চাই আমি। আমার গাধা ছেলেটা শুধু না, আমার মনে হয় আপনার মেয়েও বোধহয় ওকে ভালবাসে।'

উপমার দু'চোখ কখন জলে ভরে উঠেছে নিজেও জানেন না। জলে ডোবা দু'চোখে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'জীবনে একটু ভালবাসা চেয়েও পাইনি। ওরা যদি একে অপরকে ভালবাসে, আমি রাজি।'

উপমার কথা শেষ হতেই সূচনা যে কিছু বলেন না তা নয়। খানিক থেমে আস্তে-আস্তে তিনি বলেন, ‘এ বিয়েতে কে বেশি খুশি হবে, জানেন?’

একমুহূর্তও দেরি করেন না উপমা। বলেন, ‘কে আবার ! আপনি, আমি, আমরা সবাই।’

সূচনা আস্তে-আস্তে বলেন, ‘যাঁকে খুশি করার জন্যে আপনাকে এতদূর থেকে এখানে ডেকে এনেছি, এ বিয়েতে যিনি সবচে’ বেশি খুশি হবেন, ঐ দেখুন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।’

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও উপমা এত অবাক হত কি না কে জানে ! তিনি দেখেন, তাঁর প্রথম জীবনের স্বপ্ন দেখা, ভালবাসা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে !